রহস্য, ভৌতিক, থ্রিলার ও অ্যাডভেঞ্চার

বাংলাবুক.অর্গ

ছায়া অরণ্য

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবা প্রকাশনা

একটি উপন্যাসিকা, একটি বড় গল্প, তিনটি গল্প ও একটি ছোট গল্প নিয়ে এই বই। সবকটিই বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে লেখা—কিছু সম্পাদকের তাগাদায়, কিছু স্বেচ্ছায়। কিছু প্রকাশিত হয়েছে পত্র-পত্রিকায়, কিছু আনকোরা নতুন।

যাঁরা মূল কাহিনীগুলো পড়েছেন বা পড়বেন তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, প্রত্যেকটি কাহিনীকে আমি আমার খুশিমত ভেঙেচুরে, কমিয়ে-বাড়িয়ে মনের মত করে নিয়েছি—কল্পনার রাশ টেনে ধরে ছকবাঁধা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি।

রবার্ট মার্ফির দ্য ফ্যান্টম সেটার থেকে 'ছায়া অরণ্য', উইলিয়াম স্যামব্রটের আয়ল্যাণ্ড অভ ফিয়ার থেকে 'ভয়াল দ্বীপ', রে ব্র্যাডবেরির দি অক্টোবর গেম থেকে 'যন্ত্রণা', টি. এল. শেরেডের আই ফর ইনইকুইটি থেকে 'ইচ্ছা' প্রাইস ডে-র ফোর ও'ক্লক থেকে 'ঠিক দুক্ষুর বেলা' এবং রবার্ট আর্থারের দ্য জোকস্টার থেকে রূপান্তরিত হয়েছে 'এপ্রিল ফুল'।

আশা করি আপনার ভাল লাগবে।

কাজী আনোয়ার হোসেন
মে, ১৯৭৫

ছায়া অরণ্য

কাজী আনোয়ার হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রজাপতি প্রকাশন

ছায়া অরণ্য

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রকাশক	**প্রথম প্রকাশ**
কাজী শাহনূর হোসেন	সেবা প্রকাশনী, জুলাই ১৯৭৫
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০	**প্রজাপতি সংস্করণ**
গ্রন্থস্বত্ব লেখকের	নভেম্বর, ১৯৯২
পরিবেশক	**প্রচ্ছদ ঃ** শিবনাথ বিশ্বাস
সেবা প্রকাশনী	**অলঙ্করণঃ** হাশেম খান
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০	**মুদ্রণঃ** কাজী আনোয়ার হোসেন
শো রুমঃ	সেগুনবাগান প্রেস
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা	২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা

CHHAYA ARANNYA

Qazi Anwar Husain

ISBN - 984 - 462 - 007 - 4

যোগাযোগ

প্রজাপতি প্রকাশন

(সেবা প্রকাশনীর একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান)

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

মূল্য ॥ পঁয়তাল্লিশ টাকা

The Online Library of Bangla Books

BanglaBook.org

ছায়া অরণ্য– ৯
ভয়াল দ্বীপ– ২৩
যন্ত্রণা– ৩৩
ইচ্ছা– ৪১
ঠিক দুক্ষুর বেলা– ৬৩
এপ্রিল ফুল– ৬৮

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

ছায়া অরণ্য

১৩ জানুয়ারি, ১৯—

উহ্, ভয়ানক ধকল গেছে আজ সারাদিন।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে দোহাজারী ট্রেনে, তারপর জিপে ঝাড়া তিরিশ মাইল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছ'ইঞ্চি পুরু ধুলোর পথ। একেবারে বিতিকিচ্ছিরি কারবার। একে কাঁচা রাস্তার অসম্ভব ঝাঁকুনি, তার ওপর ধুলোর পাহাড় ধাওয়া করছে পিছন পিছন, কোন কারণে ব্রেক কষলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে গাড়ির উপর। ড্রাইভারের চেহারা দেখেই আঁচ করতে পারছিলাম নিজেরটা কেমন দেখাচ্ছে। চুল তো হয়েছেই, ভুরু, এমনকি চোখের পাপড়ি পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে ধুলোয়।

বাংলোতে পৌঁছে গেলাম সন্ধের আগেই। ছোট্ট একটা টিলার উপর আমার, মানে, ফরেস্ট অফিসারের বাংলো। সিকি বর্গমাইল পরিষ্কার জায়গা জুড়ে তিরিশ-চল্লিশটা ঘর নিয়ে একটা জনপদ। জনপদ পেরিয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কাঠের বাংলোটা। একেবারে সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল জিপ। নামলাম। জঙ্গলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে নিষ্প্রভ সূর্যটা। চারপাশে পাতলা কুয়াশা নামতে শুরু করেছে এখন থেকেই। এই অঞ্চলে বেশ শীত পড়ে বুঝতে পারলাম। চুপচাপ নিরিবিলি শান্ত একটা পরিবেশ। ভাল লাগল আমার এই নতুন কর্মস্থল।

অবশ্য ভাল না লাগলেই বা কি? যখন যেখানে বদলি করবে সেখানেই যেতে হবে আমাকে। জায়গা পছন্দ হল না বলে সাতদিন যেতে না যেতেই ঝট্ করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম, এই বিলাসিতা ইকবালকে হয়ত সাজে, আমাকে নয়। বিয়ে করিনি ঠিকই, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমি, মুখাপেক্ষী বাবা-মা, ভাই-বোন আছে। এই বাজারে আবার একটা চাকরি জোগাড় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

ইকবালের কথা অবশ্য আলাদা। শুনেছি চাকরিটা নিয়েছিল ও জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে বেড়াবার জন্যেই, সংসার প্রতিপালনের জন্যে নয়। বড়লোকের ছেলে।

BanglaBook.org

চাকরি না করলেও ওর চলে। কিন্তু কাজটা ও পছন্দ করত বলেই জানতাম। ভূতের মত পরিশ্রম করত ও, বড় সাহেবের নেক নজরে ছিল, প্রমোশনও হয়ে যাচ্ছিল খুব শিগগিরই। সত্যিই, হঠাৎ এরকম খেপে গেল কেন লোকটা? এই সেদিন শ্রীপুর থেকে বদলি হয়ে এখানে এসে কাজে যোগ দিল খুশি মনে। ঢাকায় সবাইকে বলে এল প্রাণ ভরে শিকার করবে এ বছর। অথচ সাতদিন যেতে না যেতেই পাল্টে গেল মত, সোজা ঢাকায় গিয়ে খামোকা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে রিজাইন দিল চাকরিতে। একগুঁয়ে লোক জানি, ম্যান অফ প্রিন্সিপ্‌ল্—কিন্তু তাই বলে চাকরিটা···আশ্চর্য···।

যাকগে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এসে পড়েছি। বলছিলাম, জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে। সুন্দর বাংলো, আগাগোড়া কাঠের। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চমৎকার একটা দক্ষিণমুখী টানা বারান্দা। ঘর তিনটে। একটা বসবার ঘর, একটা শোবার, আরেকটা অফিস। অফিসের দরজায় তালা, বাকি দুটো ঘরের দরজা-জানালা খোলা হয়েছে আমার আসবার সংবাদ পেয়ে। ড্রাইভার সালাম আমার মালপত্র মাঝের ঘরে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল, জিপটা গ্যারেজে তুলে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। কাছেই নাকি বাড়ি।

সিঁড়ির মুখেই লম্বা সালাম ঠুকল টুথব্রাশের মত খোঁচা খোঁচা গোঁফঅলা বেঁটেখাটো এক বয়স্ক লোক। উর্দি দেখে অনুমান করলাম, বাবুর্চি।

'কি নাম হে তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম।

'স্যার, বুরুজ আলী। বাবুর্চি, স্যার।'

'কি বললে? স্যার বুরুজ আলী? বেশ বেশ। জলদি এক বালতি পানির ব্যবস্থা কর দেখি। ধুলোবালিতে কিচকিচ করছে সারা গা, গোসল করব।'

'স্যার, এখনি দেব? তৈরি আছে, স্যার।'

'বাহ্, চমৎকার! তৈরি করেই রেখেছ? গুড। হ্যাঁ, এক্ষুণি দাও।'

চলে যাচ্ছিল, থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, রাতে কি খাবেন? ভাত না রুটি, স্যার?'

'তোমার যা খুশি। আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই। দুটোই চলে,' হঠাৎ মনে পড়ল বাংলো গার্ডের অনুপস্থিতি। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাংলোর গার্ড কোথায়? ওকে দেখছি না।'

'স্যার, শুকুরকে বাজারে পাঠিয়েছি, স্যার।'

খুশি হয়ে উঠলাম স্যার বুরুজ আলীর উপর। আদর্শ বাবুর্চি। সবদিকে নজর আছে। ইশারায় ওকে রান্নাঘরের দিকে বিদায় করে দিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। সেই তুলনায় আসবাব কম। কিন্তু সাজানো গোছানো। এপাশে একটা ডাব্‌ল খাট, ওপাশে ড্রেসিং টেবিল, জানালার পাশে একটা রাইটিং টেবিল, বুক শেলফ, দুটো চেয়ার—একটা ইজি, আরেকটা বিজি। ছোট আলনা রয়েছে বাথরুমের দরজার পাশে। আধ-ময়লা একটা গেঞ্জি ঝুলছে ওটার নিচের তাকে। খাটের তলায় এক জোড়া পুরানো স্লিপার। বোধহয় ভুলে ফেলে গেছে ইকবাল। দেয়ালের একটা তাকে কয়েকটি ওষুধের শিশি, কোনটা প্রায়-খালি, কোনটা আধ-খালি, কিন্তু কোনটাই খালি নয়। প্রশস্ত অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম। একটা আণ্ডারওয়্যার ঝুলছে ব্রাকেটে। এটাও নিশ্চয়ই ইকবালের। বাম হাতের দুই আঙুলে তুলে ফেলে দিলাম ওটাকে জানালা দিয়ে বাইরে। ড্রইং-কাম-ডাইনিংরুমে ডাইনিং টেবিল-চেয়ার ছাড়াও সুন্দর করে সাজানো রয়েছে একটা স্প্রিঙের সোফা সেট। সোফার পাশে টিপয়ের উপর খোলা পড়ে রয়েছে জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা। বুঝলাম, যাবার সময় খুব তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গুছিয়েছে ইকবাল। হঠাৎ করেছ স্থির করেছ চলে যাওয়া।

BanglaBook.org

'স্যার, গোসলখানায় গরম পানি দিয়েছি, স্যার।'

এ ঘরে হারিকেন জ্বেলেছে বুরুজ আলী। বাক্স থেকে বন্দুকটা বের করে খাটের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছে খাড়া করে। হোল্ডল খুলে বিছানা তৈরি করছে এখন দক্ষ হাতে। সুটকেস থেকে জামা-কাপড় তোয়ালে সাবান বের করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম।

বিরাট এক বালতি গা-সওয়া গরম পানি। মনের সুখে ঝপাঝপ্ পানি ঢাললাম গায়ে-মাথায়, সাবান মেখে সমস্ত ধুলো দূর করলাম সর্বাঙ্গ থেকে।

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আবছা হয়ে আসছে জঙ্গলটা। গা মুছতে মুছতে জানালার কাছে খস্‌খস্ শব্দ পেলাম। জানালার কাছে যেতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতরটা। কি যেন নড়ছে নিচে! ঠাহর করে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা কালো কুকুর। বিলেতী। ঘাড় নিচু করে ইকবালের জাঙ্গিয়াটা শুঁকছিল, আমার সাড়া পেয়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে জঙ্গলের ভিতর চলে গেল।

'জানালাটা বন্ধ করতে করতে একবার ভাবলাম, কার কুকুর ওটা? এখানে কুকুর পোষে কে আবার?

বাথরুমের দরজাটা খুলেই আবার একবার চমকে উঠলাম। ভয়ঙ্করদর্শন এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দার কাছে শোবার ঘরের দরজায়। ঘরে আর কেউ নেই। স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদেই চট্ করে একবার বিছানার পাশে বন্দুকটার দিকে চোখ গেল, পরমুহূর্তে দৃষ্টি গেল আবার লোকটার দিকে। দেখলাম মাথা ঝুঁকিয়ে বিনীত সেলাম জানাচ্ছে লোকটা আমাকে। নিশ্চয়ই বাংলো-গার্ড। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর চেহারা! প্রকাণ্ড শরীরের কাঠামো, কিন্তু সারা শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই, অসংখ্য ভাঁজ খাওয়া চামড়া ঝুলঝুল করছে। চোখ দুটো কোটরে, উঁচু চোয়াল, একগাছি চুলও নেই মাথায়। ফলে ওর মাথার খুলির আকৃতিটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে। বয়স আন্দাজ করা যায় না।

'ওয়ালাইকুম সালাম। তোমার নাম শুকুর মিঞা?' অপ্রতিভ, হতবুদ্ধি ভাবটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'জি, হুজুর।'

উঃ! কী ভারি গলার আওয়াজ!

হঠাৎ করে আর কোন কথা পেলাম না খুঁজে। কি বলব? একটু চুপ করে থেকে পরিবেশটা সহজ করবার জন্যে খাটের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'ছারপোকা নেই তো? খাটমল? ঘুমানো যাবে রাতে?'

'না, হুজুর।'

'কি বললে? ঘুমানো যাবে না?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'না, হুজুর। খাটমল নেই।'

কি বলতে চাইছে পরিষ্কার হল না। আমার মনে হল ও বলতে চাইছে ছারপোকা নেই, কিন্তু তবু ঘুমানো যাবে না। কি ব্যাপার? ভূতটুত আছে নাকি? ইকবালই বা হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল কেন?

সিঁথি করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইকবাল সাহেবের আগে এখানে এফ. ও. কে ছিলেন?'

'কামাল সাহেব, হুজুর।'

'উনি কতদিন ছিলেন এখানে?'

'আড়াই বছর, হুজুর।'

BanglaBook.org

আশ্বস্ত হলাম কিছুটা। কিন্তু অস্বস্তি গেল না। বুরুজ আলী এসে হাজির হল এমন সময়। কখন খাব জিজ্ঞেস করল, বললাম, আটটায়। অফিস সংক্রান্ত দু'একটা টুকিটাকি কথাবার্তার পর কুকুরটার কথা জিজ্ঞেস করলাম ওদের। একটু যেন চমকে উঠল দু'জনেই, একসাথে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে।

'স্যার, কুকুরটা কারও না। ঐ গ্রামে থাকে, স্যার।'

'কিন্তু গ্রামের দিকে তো গেল না ওটা, জঙ্গলের দিকে গেল।'

একথার জবাব দিল না কেউ। চট্ করে একবার পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা আমি মুখ ফিরাতেই। কিন্তু আয়নায় পরিষ্কার দেখলাম আমি। সতর্ক থাকতে হবে। এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ কি? যেন কিছুই বুঝিনি এমনি ভাব করে বিদায় দিলাম ওদের।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বন্দুকটা পরিষ্কার করলাম যত্নের সাথে। দুটো টোটা ভরে রাখলাম ওতে। রাত এখন পৌনে দশটা। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর ঝট্‌পট্, হুটোপুটি, খস্ খস্ শব্দ। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ, দূরের একটা উঁচু জংলা পাহাড়ের মাথার উপর। রহস্যময় মনে হচ্ছে পাহাড়টাকে। বেশ কাছেই কোথাও ডালে বসে ভূতুম প্যাঁচা ডাকছে থেকে থেকে।

সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। বাতি কমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব এখুনি।

১৫ জানুয়ারি, ১৯—

গত পরশুদিন ডায়েরীর পাতায় কি লিখেছিলাম চোখ বুলাতে গিয়ে হাসি পাচ্ছে এখন। কেমন একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলাম ডায়েরীর পাতায়। নতুন জায়গায় এলে প্রথম রাতে বোধহয় এমনই লাগে। সবকিছুতেই কেমন যেন ভয় আর সন্দেহ। অথচ সারারাত সেঁটে ঘুম দিয়ে পরদিন ভোরে উঠেই মিলিয়ে গেছে সব সন্দেহ, সব অস্বস্তি। কাজের ঠ্যালায় অস্থির হয়ে থেকেছি সারাটা দিন।

এই দু'দিন খুব কাজ করলাম। চার্জ বুঝিয়ে দেয়ার কেউ নেই, তাই খাটুনি পড়েছে বেশি। অনেক ঘুরেছি। ইন্টিরিয়ারের কয়েকটা ক্যাম্পে ভিজিট করেছি, কাঠের ব্যবসায়ীদের সাথে পরিচয় করেছি, কথাবার্তা বলেছি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে নিজে তদারক করেছি। এ ছাড়া অফিসের কাগজপত্র ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে বুঝে নেয়া তো আছেই।

শুকুর মিঞা লোকটা একটা অ্যাসেট। অর্ধেক কাজ বাঁচিয়ে দিয়েছে আমার। বিশ বছর চাকরি করছে এই ডিপার্টমেন্টে, সবকিছুর নাড়ীনক্ষত্র ওর জানা। যখন যেটা দরকার এগিয়ে দিচ্ছে হাতের কাছে। ওর সাহায্য না পেলে অকূল পাথারে পড়তাম।

আর বুরুজ আলী রীতিমত এক্সপেরিমেন্ট চালাতে আরম্ভ করেছে আমার পেটের উপর। রীতিমত সপ্তব্যঞ্জনের ভোজ চলেছে রোজ। আমার পেটে কতটা সহ্য হয় তারই পরীক্ষা নিচ্ছে বোধহয় ও। প্রতিদিন নিত্য নতুন কয়েক পদের ভাজি, ভর্তা, তরকারি, মাছ, মাংস। এই রেটে চললে আধমনী এক ভুঁড়ি গজিয়ে যাবে মাসখানেকের মধ্যেই। ও বায়না ধরেছে মোরগ-পোলাও রাঁধবে একদিন। কিন্তু মোরগ শিকার করে এনে দিতে হবে। জংলী মোরগ-পোলাও নাকি অপূর্ব।

ও-হ্যাঁ, সেই মালিকবিহীন কুকুরটার সাথে বেশ প্রেম জমে গেছে আমার। শিকারি কুকুর। ওটাকে নিয়ে একদিন মোরগ শিকারে গেলে মন্দ হয় না। দেখি, তার আগে ওটাকে আরেকটু বশ করে নিতে হবে।

BanglaBook.org

১৭ জানুয়ারি, ১৯—

কাজ, কাজ আর কাজ। কাঠ কাটার সিজন, তাই দৌড়-ঝাঁপ করতে হচ্ছে এত।

চৌধুরী সাহেবের সাথে আলাপ হল পরশুদিন। এই দুইদিনেই বেশ জমে উঠেছি দু'জন। কাঠের ব্যবসায়ী। দুটো স'মিল আছে ওঁর। খুব অমায়িক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সদালাপী হাসিখুশি মানুষ। ইকবালের সাথেও বন্ধুত্ব করে নিয়েছিলেন। সন্ধের দিকে এসে হাজির হয়েছিলেন আজ, ওঁর সাথে গল্প করে বেশ কাটল সময়টা।

কিন্তু কুকুরটাকে দেখতে পেলেন না কেন ভদ্রলোক? আমার হাত থেকে বিস্কিট খাচ্ছিল কুকুরটা, আচমকা ওঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে এক লাফে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। ওঁর পাশ দিয়েই গেল, কিন্তু আশ্চর্য, টেরও পেলেন না উনি। ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নয়। অথচ অন্য মানুষ হলে আঁৎকে উঠত নির্ঘাৎ। হঠাৎ মনে হল, অন্ধ নয় তো ভদ্রলোক?

কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'কুকুরটা দেখতে পাননি আপনি?'

'কোন্ কুকুর?' একটু যেন চমকে উঠলেন চৌধুরী সাহেব। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে।

'এই যে একটু আগে বেরিয়ে গেল বাইরে, কালো কুকুরটা?'

সামলে নিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি।' কিন্তু দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন তিনি। ইকবালের কথায় চলে গেলেন। বললেন, 'ইকবাল সাহেব কিন্তু খুব পাকা শিকারি ছিলেন। চমৎকার মোরগ-পোলাও খেয়েছি সেদিন এখানে। আপনি শিকার-টিকার করেন না?'

এরপর শিকারের গল্পে মেতে গেলাম আমরা। চা দিয়ে গেল শুকুর বার দুয়েক। রাতে এখানেই খেয়ে যেতে বললাম, উনি হেসে বললেন, 'খাব আর এক দিন। মোরগ মেরে আনুন, মোরগ-পোলাও খাব।'

আজ বন্দুকের টোটাগুলো শিকারের ব্যাগে গুছিয়ে নিয়েছি বুরুজ আলীকে দিয়ে। পরশু রোববার। ভাবছি কুকুরটাকে নিয়ে শিকারে যাব।

কাল খুব ভোরে উঠে বেরুতে হবে কাজে। শুয়ে পড়ি এখন। বেশি রাত জাগলে উঠতে পারব না সকালে।

১৮ জানুয়ারি, ১৯—

বেশ এগোচ্ছে কাজ। খাটুনি হচ্ছে খুবই, কিন্তু ভালও লাগছে। গুছিয়ে এনেছি প্রায়।

ইকবালের ডায়েরীটা পেয়ে গেলাম কাল হঠাৎ করে। টেবিলে বসে লেখার অভ্যাস আমার, কিন্তু কাল রাতে বিছানায় উপুড় হয়ে লিখছিলাম। কনকনে শীতে লেপের তলা ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করল না, তাই লেখা শেষ করে মোটা তোশকটার নিচে গুঁজে দিলাম ডায়েরীটা। হাতে কি একটা ঠেকল, বের করে দেখি আরেকটা ডায়েরী! মলাট উল্টে দেখলাম, ইকবালের নাম। সে-ও বোধহয় লেপ ছেড়ে ওঠার ভয়ে রেখেছিল ওটা তোশকের নিচে, যাবার সময় ভুলে ফেলে গেছে। ইচ্ছে করল, পড়ে দেখি। কিন্তু লোভ সংবরণ করে নিলাম। গুঁজে দিলাম ওটা আবার যথাস্থানে। নিজের কঠোর নীতিপরায়ণতায় নিজেকে খানিক বাহ্‌বা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজ সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরেছি, ডায়েরীটার কথা একবারও মনে পড়েনি। কিন্তু এখন বড্ড লোভ হচ্ছে। সামনেই রয়েছে ওটা। জানি আড়ি পেতে কারও কথা শোনা, কারও চিঠি বা ডায়েরী তার অজান্তে পাঠ করা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু

BanglaBook.org

কাকপক্ষীও টের পাবে না নিশ্চিত জেনে লোভটা সংবরণ করাও কঠিন। কি আছে ডায়েরীর মধ্যে কে জানে! প্রেয়সীর ফটো থাকা বিচিত্র নয়···হয়ত আমার খুব পরিচিত চেনা মেয়ে···এক যুবকের গোপন কথা রয়েছে এর পাতায় পাতায়। কৌতূহল দমন করতে পারছি না। নাহ্, নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। দেখি উল্টেপাল্টে···

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!

আধঘন্টা আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি, কারও ডায়েরীর দশ বারোটা পাতা এমন ভয়ানকভাবে আলোড়িত করে তুলতে পারে আর কাউকে। আজ সারারাত ঘুম হবে না। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছি। উত্তেজিত অবস্থায় ঠিকমত কাজ করছে না মাথাটা। অথচ আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে আজই রাতে।

ব্যাপারটা গুছিয়ে লিখে ফেলি, তাহলে হয়ত মাথাটা একটু পরিষ্কার হবে, ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করতে পারব নির্ভুলভাবে। হ্যাঁ, লিখেই ফেলি।

ফটো নেই। প্রেমের উপাখ্যানও নেই। এ বছরেরই ডায়েরী। নতুন। জানুয়ারির চার থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত ছয়টা দিন ধরে রাখা আছে ডায়েরীর কয়েকটা পাতায়। ঝরঝরে পরিষ্কার হাতের লেখা ইকবালের।

প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলাতে গিয়ে 'কুকুর' কথাটার উপর চোখ আটকে গেল। পড়ে ফেললাম চার তারিখ থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত পাতা ক'টা। অবাক হয়ে দুটো ডায়েরীর অবিশ্বাস্য মিল লক্ষ্য করলাম। ওরটা প্রায় হুবহু আমারই ডায়েরীর নকল। কিংবা আমারটা ওর ডায়েরীর। প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের দু'জনের প্রথম এখানে এসে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বুরুজ আলী, শুকুর, চৌধুরী, কুকুর—সব মিলে যাচ্ছে। প্রায় হুবহু।

আবার পড়তে আরম্ভ করলাম। এবার ইকবাল এগিয়ে আছে আমার থেকে। সাত, আট, নয় তারিখে ইকবাল যে অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখেছে, প্রায় সেগুলোই আমার জীবনে নিশ্চয়ই ঘটতে যাচ্ছে আগামীকাল-পরশু-তরশু, কিংবা কয়েক দিনের ভিতর। অর্থাৎ ওর অতীত জানতে গিয়ে আমার নিজের ভবিষ্যৎ জানতে পারব আমি ইকবালের ডায়েরীটা পড়লে। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে গায়ে কাঁটা দিল। ডায়েরীতে কেউ সাধারণত মিথ্যেকথা লেখে না। তাছাড়া ইকবাল মিথ্যে লেখার লোকও নয়। ওর প্রতিটা কথা অকপটে বিশ্বাস করছি আমি। সত্যিই আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি আমি ওর ডায়েরীর পাতায়। উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ!

জানুয়ারির সাত তারিখে ও লিখেছেঃ

কি যেন চেপে যাচ্ছে সবাই আমার কাছ থেকে। কুকুরটার ব্যাপারে আমার সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে সবাই। কিন্তু অনুভব করছি, সবাই, এমন কি চৌধুরী সাহেব পর্যন্ত, মনেপ্রাণে চাইছে আমার শিকারে যাওয়া। ঘুরে ফিরে কেবল শিকারের কথা তোলে।

বিকেলে পশ্চিমের জঙ্গলে হাঁটতে গিয়েছিলাম। কুকুরটা গেল সাথে সাথে। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম রীতিমত ট্রেনিং পাওয়া Setter এটা, পাকা শিকারি, পয়েন্টার। এই এলাকায় এল কি করে এটা, কে-ই বা ট্রেনিং দিল ওকে? কোন বিদেশী শিকারির হারিয়ে যাওয়া কুকুর নাকি?

জঙ্গলে ঢুকেই শিকারের খোঁজে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াতে আরম্ভ করল কুকুরটা। কখনও আমার সামনে, কখনও পাশে, কখনও পিছনে। একটা ঝোপের সামনে হঠাৎ

BanglaBook.org

থমকে দাঁড়াল। শিকার দেখতে পেয়েছে। সামনের দুই পা নিচু করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকলাম। পালিয়ে যাচ্ছিল মোরগটা। অপূর্ব কৌশলে ওটার গতি পরিবর্তন করিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে এল কুকুরটা আমার সামনে। খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়েছে, দৌড়ে এদিকে আসছে মোরগটা। অনেকটা কাছে এসে আমাকে দেখতে পেয়েই কঁক কঁক আওয়াজ তুলে আকাশে উঠল সেটা। ত্রিশ চল্লিশ গজ উড়ে গিয়ে পড়ল একটা ঝোপের উপর, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দুক আনিনি সাথে, তবু বাম চোখ বন্ধ করে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে সুইং করে ট্রিগার টিপলাম উড়ন্ত মোরগ লক্ষ্য করে, মনে মনেই ধরাশায়ী করলাম ওটাকে। কুকুরটা লেজ নাড়ছে পাশে দাঁড়িয়ে।

খুব খুশি লাগছে। এরকম একটা গুণী কুকুর সাথে থাকলে শিকারে আনন্দ আছে। বন্দুকটা পরিষ্কার করে ফেললাম একটু আগে। কাল সকালে বেরোবো শিকারে। পুবের ঐ উঁচু পাহাড়টা, যেটার মাথায় চাঁদ উঠেছে, ঐখানে যাব কাল জিপ নিয়ে। এ কয়দিনের ঘোরাঘুরিতে ঐ পাহাড়ের চারপাশটা মুখস্থ হয়ে গেছে আমার।

জানুয়ারির আট তারিখে শুধু হতাশা আর হা-পিত্যেশ। মাত্র কয়েকটা লাইন। বোঝা যাচ্ছে খুব মন খারাপ নিয়ে ঘুমিয়েছে সে রাতে ইকবাল। লিখেছেঃ

সেজেগুজে বসে থাকাই সার হল আজ। এল না কুকুরটা। বেলা এগারটা পর্যন্ত ব্যাটার জন্যে অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বন্দুক হাতে ঘুরে এলাম পশ্চিমের জঙ্গল থেকে। বেশ অনেকটা হাঁটলাম। মনে আশা ছিল, জঙ্গলে হয়ত দেখা হয়ে যাবে ওর সাথে। ভেবেছিলাম, কপাল ভাল হলে গত কালকের মোরগটা হয়ত আর একবার চান্স দিতেও পারে। কিন্তু কিসের কি। কারও লেজের চিহ্নও দেখলাম না। মনটাই খারাপ হয়ে গেল আজ। কিছু ভাল্লাগছে না।

জানুয়ারির নয় তারিখে সম্পূর্ণ অন্য এক ইকবাল লিখছে আশ্চর্য এক অবিশ্বাস্য, অবাস্তব কাহিনী। লিখেছেঃ

আজকের ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজছি না। কোন ব্যাখ্যারই কোন প্রয়োজন নেই আমার। ব্যাখ্যা আসলে নেই-ও।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলতেই দেখলাম কুকুরটা বসে আছে খাটের পাশে। মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল মনটা খুশিতে। দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে পরে নিলাম শিকারি পোশাক। হাঁক দিতেই টেবিলে নাস্তা দিয়ে গেল বুরুজ আলী। ঝটপট খেয়ে নিলাম কিছু, বেশির ভাগ রুটি-মাখনই গেল কুকুরের পেটে। তৈরি হয়ে বন্দুক নিয়ে উঠে বসলাম জিপের ড্রাইভিং সিটে। ভাগ্যিস জঙ্গলের রাস্তায় ট্রাফিক পুলিস থাকে না। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই আমার। আমাকে গাড়িতে উঠতে দেখে কুকুরটাও একলাফে উঠে বসল গাড়ির পিছনে। ছুটলাম।

তিন ঘন্টা লাগল আঁকাবাঁকা ঘুরপথ ধরে পাহাড়টার কাছে পৌঁছতে। পাহাড়ের পুব ঘেঁষে চলে গেছে রাস্তাটা একেবারে বর্মার বর্ডারে। জিপ রেখে জঙ্গলে নামলাম। পাহাড়টার চারপাশে এক পাক ঘুরেই ফিরে যাব ঠিক করলাম।

কুকুরটা চলেছে আগে আগে। লেজ নাড়ছে মনের আনন্দে। এদিক ওদিক ঝোপের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে, আবার এগোচ্ছে। এখান থেকে গাছ কাটা হয়েছে বলে জঙ্গলটা বেশ হাল্কা, কিন্তু ঝোপঝাড় খুব বেশি। উঁচু পাহাড়টার আশপাশে ছোটখাট অনেক টিলা, অনেক খাড়াই, উতরাই, উপত্যকা। মোরগ শিকারের জন্যে চমৎকার। চারদিকে চমৎকার পরিবেশ। ঘুঘু ডাকছে ডালে বসে। এগোলাম।

BanglaBook.org

বেশ কিছুদূর গিয়ে কুকুরটাকে আর দেখতে পেলাম না। কোথায় গেল? থেমে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইলাম, পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম কান পেতে। এমনি সময়ে হঠাৎ মেঘে ঢাকা পড়ল সূর্যটা। গাঢ় ছায়া নামল জঙ্গলের অভ্যন্তরে। ঠাণ্ডা একটা হাড় কাঁপানো বাতাস বয়ে গেল খড়মড় শব্দে শুকনো পাতা উড়িয়ে। কাঁটা দিয়ে উঠল গা-টা। শিউরে উঠলাম একবার। সমুদ্রের গর্জন যেন শুনতে পাচ্ছি বেশ কাছে। পরমুহূর্তে আবার হেসে উঠল সূর্য। মেঘ কেটে গেছে। অন্ধকার দূর হয়ে গেল। পাতার ফাঁক দিয়ে অসংখ্য রোদের টুকরো এসে ঝিলমিল করছে আবার বনভূমিতে পড়ে।

কুকুরটাকে দেখতে পেলাম কয়েক পা এগিয়েই। ঐ সামনে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। জঙ্গলটা যেন অত্যন্ত নিবিড় মনে হচ্ছে। গাছগুলো আরও উঁচু, আরও মোটা, আরও প্রাচীন মনে হচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়গুলোও আরও ঘন লাগছে। মনে হচ্ছে যেন এ জঙ্গলে কোনদিন মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। থেমে দাঁড়িয়ে ভাল করে লক্ষ্য করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম কুকুরটা পয়েন্ট করছে। দ্রুত এগোলাম ওদিকে নিঃশব্দ পায়ে। কাছাকাছি পৌঁছতেই উড়ল একজোড়া মোরগ। সামনেরটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম, কিন্তু গুলি মিস্ হয়ে লাগল পিছনেরটায়। ঝপাৎ করে পড়ল সেটা। ডেড্ শট। কিন্তু মোরগটা তুলে আনার লক্ষণ নেই, তেমনি পয়েন্ট করে রয়েছে কুকুরটা। এমনি সময় কঁক কঁক শব্দ তুলে বারো-চোদ্দটা মোরগ-মুরগী একসাথে উড়ল। পরমুহূর্তে আরেক ঝাঁক। জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি। হাঁ করে চেয়ে রইলাম গুলি করবার কথা ভুলে গিয়ে।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখলাম ইতিমধ্যে গুলি খাওয়া মোরগটা মুখে করে নিয়ে এসে আমার পায়ের কাছে রেখেছে কুকুরটা। আবার শিকার খুঁজতে লেগে গেছে সে। খালি কার্তুজটা ফেলে দিয়ে আরেকটা গুলি ভরে নিয়ে দুটো ব্যারেলই প্রস্তুত রাখলাম। মোরগটা পিঠে বাঁধা ব্যাগে ভরে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সিকি মাইল যেতে না যেতেই আবার পয়েন্ট করল কুকুরটা। প্রথমে শূন্যে উঠল তিনটে মোরগ, ফেলে দিলাম একটাকে। বেশ খানিকটা দূরে ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ল সেটা ডানা ঝাপটিয়ে। গুলির শব্দে উড়ল আরেকটা, সেটাও নামালাম। দ্রুত গুলি ভরে নিলাম আবার, কারণ এখনও পয়েন্ট করে আছে কুকুরটা। এবার এক সাথে ডানা ঝাপটে কানে তালা লাগিয়ে আকাশে উঠল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা। এই ঝাঁক থেকে সবচেয়ে বড়টা বেছে নিয়ে ফেললাম। শিকারির স্বর্গে এসে হাজির হয়েছি যেন। খুশিতে লাফাচ্ছে কুকুরটা ভাল শিকারি পেয়ে। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটোছুটি করে তিনটেই সংগ্রহ করে আনল।

নিঃসন্দেহে লিখে দিতে পারি, আমার শিকারি জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন আজ। চারটে মোরগ হয়ে গেছে, এবার ঠিক করলাম কেবল কঠিন অ্যাঙ্গেলের মোরগগুলোই মারব, সোজা মার মেরে শুধু শুধু হত্যা করব না। আবার এগোলাম। কেমন একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় পেয়ে বসেছে আমাকে। সমুদ্রের গর্জনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। যদিও কেমন যেন অবাস্তব লাগছিল আমার কাছে সব কিছু, আবছাভাবে বুঝতে পারছিলাম কি যেন একটা ঘটে গেছে, জঙ্গলটা ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে, কিসের যেন একটা অস্বস্তি রয়েছে মনের মধ্যে—কিন্তু মনের পর্দায় পরিষ্কার হচ্ছে না ব্যাপারটা শিকারের উত্তেজনায়।

বাঘের গর্জন শুনতে পেলাম। ভয়ের কিছুই নেই, বহুদূর থেকে এসেছে শব্দটা। অন্তত দু'তিন মাইল। হাঁটতে হাঁটতে সেই সুন্দর, নিরিবিলি ঝর্নাটার কাছে চলে এসেছি। গত পরশু এসেছিলাম এখানে। ঝর্নার ধারে তিন-চারটে গোল চৌবাচ্চার সৃষ্টি

BanglaBook.org

হয়েছে। আট ন'ফুট গভীর, কিন্তু একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যায় পরিষ্কার। স্থির স্বচ্ছ পানি। কয়েকটা বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। একটা পাথরের ওপর বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিয়ে একটা চৌবাচ্চা থেকে আঁজলা ভরে পানি খেলাম। একটা ছায়া নড়ে উঠল পানির ভিতর। দুলছিল পানি, তারই মধ্যে দেখতে পেলাম মিশমিশে কালো কোন এক জন্তুর প্রতিবিম্ব। ঝট্ করে তাকালাম ওপারের একটা গাছের ডালে। একনজর দেখতে পেলাম কেবল। গাছের এক ডাল ধরে ঝুলে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্য ডালে। কি ওটা? শিম্পাঞ্জী, না ওরাং ওটাং? নাকি হনুমানকে চোখের ভুলে শিম্পাঞ্জীর মত লাগল?

এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামালাম না। শিকারের মোহে আছি তখন। কুকুরটা ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক, অস্থির হয়ে উঠেছে আমার দেরি দেখে। রওনা হলাম। আবার লেজ নাড়তে নাড়তে মনের আনন্দে চলেছে কুকুরটা আগে আগে। অল্পক্ষণেই আবার মোরগের আড্ডা খুঁজে বের করে ইঙ্গিত দিল আমাকে।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আরও পাঁচ-ছয়শো মোরগ দেখলাম। আমার ব্যাগে এখন আটটা। আর গুলি করব না স্থির করেছি। এখন কেবল দেখব। দু'চোখ ভরে দেখে নেব।

মোহাচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে এসে পড়েছি প্রায়। কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছি না, একটু বেশি এগিয়ে গেছে বোধহয়। পরিচিত একটা বড় পাথর দেখে থামলাম। কিন্তু কুল গাছটা কোথায় গেল? পরশু দিনই না জংলী কুল পেড়ে খেলাম ঐ গাছটা থেকে!

অবাক হওয়ার অবসর পেলাম না। পিছনে ধুপধাপ ভারি পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়েই পাথরের মত স্থির হয়ে জমে গেলাম আমি। হিম হয়ে গেল কলজেটা। গণ্ডার! দুটো বড়, আর একটা বাচ্চা। চলে যাচ্ছে দক্ষিণের গভীরতর জঙ্গলে। দেখতে পায়নি আমাকে।

মুহূর্তে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল আমার। এ কি করে সম্ভব! চট্টগ্রামের জঙ্গলে গণ্ডার! বিংশ শতাব্দীতে! বইয়ে পড়েছি পাঁচ-ছয়শো বছর আগে নাকি এই জঙ্গলে গণ্ডার ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে···অসম্ভব!

রীতিমত ভয় পেয়ে গেছি এবার আমি। সাবধানে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটতে শুরু করলাম। দুটো এল.জি. ভরে নিলাম বন্দুকের চেম্বারে। অল্প কিছুদূর গিয়েই জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে খোলা সমুদ্র দেখতে পেলাম। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের পায়ের কাছে। এখানে সমুদ্র এল কি করে?

পনের মাইল দূরের সমুদ্র হঠাৎ এখানে কি করে আসে? গায়ে চিমটি কাটলাম। না তো, জেগেই তো আছি!

হঠাৎ সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। পনের মাইল দূরে সরে গেছে এখন, কিন্তু পাঁচশো বছর আগে ঠিক এখানেই ছিল সমুদ্রটা। আমি পাঁচশো বছর আগের অতীতে চলে গেছি!

ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ঘাড়ের কাছে অনুভব করলাম খসখস করে খাড়া হয়ে যাচ্ছে মাথার চুল। চুলের ফাঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকে ঠাণ্ডা লাগছে ঘাড়ে-মাথায়। পাঁচশো বছর আগের ঠাণ্ডা হাওয়া!

মানুষের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। দুইজন লোক কথা বলতে বলতে এদিকে আসছে! পঞ্চদশ শতাব্দীর পোশাক পরা দু'জন ইউরোপীয়ান। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, তীর থেকে আধ মাইল দূরে প্রাচীনকালের একটা মাস্তুল লাগানো সমুদ্রগামী জাহাজ

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে, দুলছে ঢেউয়ের দোলায়। একটা ছোট নৌকো করে এসেছে লোক দু'জন। নৌকোটা বালির উপর টেনে তুলে গাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা। সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। প্রাচীন কোন পেইন্টিং থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে সেকালের দু'জন দুঃসাহসী নাবিক। সেই পোশাক, সেই জুতো, সেই টুপী। দু'জনের কাঁধে দুটো-দুটো চারটে বড় সাইজের মুখ বাঁধা থলে। একজনের কোমরে গোঁজা জাদুঘরে দেখা একটা পঞ্চদশ শতাব্দীর পিস্তল। অন্যজনের হাতে একটা নেভা মশাল। জঙ্গলে ঢুকছে কেন ওরা?

সাবধানে গাছের আড়ালে আড়ালে পিছিয়ে যেতে থাকলাম। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি ওদের কণ্ঠস্বর, কিন্তু একবর্ণও বুঝতে পারছি না কি বলছে। বেশ কিছুদূর পিছিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজলাম। সেই পরিচিত পাথরটার কাছে চলে এসেছি আমি আবার পিছিয়ে। বিংশ শতাব্দীর সেই কুল গাছটা জন্মেইনি এখনও। একলাফে পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। কিন্তু এই পাথরটার দিকেই আসছে ওরা হন হন করে হেঁটে। কি করি ভাবছি, এমন সময় গর্তটা চোখে পড়ল। পাথরটার গা ঘেঁষে একটা ছোট্ট গুহামুখ, চারপাশে লতাপাতা দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। সড়াৎ করে নেমে পড়লাম ভিতরে। দেখলাম গুহার ভিতরটা বেশ প্রশস্ত, লম্বাতেও বিশ-পঁচিশ হাতের কম হবে না।

আশ্চর্য! এই গুহার কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল লোক দু'জন। এবার ভিতরে ঢুকছে। বেশ খানিকটা ভিতরে সরে গেলাম, অন্ধকার একটা জায়গা বেছে নিয়ে এবড়োখেবড়ো দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মচ্‌মচ্‌ জুতোর শব্দ তুলে আমার এক হাত সামনে দিয়ে চলে গেল ওরা গুহার আরও অভ্যন্তরে। ওদের গায়ের হাওয়া লাগল আমার নাকে-মুখে। মদের গন্ধ পেলাম। অন্ধকারের মধ্যেই কিছুদূর এগিয়ে থেমে দাঁড়াল ওরা। ভাবলাম এইবার পা টিপে বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে। এমনি সময়ে জ্বলে উঠল মশালটা। দম বন্ধ করে দেয়ালের গায়ে আরও সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মশালটা বালিতে গেঁথে কাঁধের থলিগুলো নামিয়ে রাখল ওরা নিচে, তারপর দু'হাতে একটা জায়গা থেকে শুকনো বালি সরাতে আরম্ভ করল। হাতখানেক বালি সরিয়ে বালির নিচে গাঁথা প্রকাণ্ড একটা বাক্সের ডালা খুলে ফেলল ওরা। চক্‌চক্‌ করে উঠল ভিতরটা। একজন একমুঠো সোনার মোহর তুলল হাতে, তারপর মুঠি আলগা করে ছেড়ে দিল। ঝনঝন শব্দ উঠল মোহরে মোহরে ঠোকাঠুকি খেয়ে। হেসে উঠল দু'জন। লোভে চিকচিক করছে ওদের চোখ। নতুন চারটে থলির মুখের বাঁধন খুলে ঝনঝন শব্দে ঢালল ওরা বাক্সের ভিতর। তারপর ডালা নামিয়ে বালি দিয়ে ঢেকে দিল।

সব বুঝলাম পরিষ্কার। এরা পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ জলদস্যু। ধনরত্ন লুট করে এনে লুকিয়ে রাখত ওরা এই গুহার ভিতর।

কাজ শেষ করে ওরা উঠে দাঁড়াতেই চমকে গেলাম আমি। এবার ফিরে যাচ্ছে ওরা। মশাল হাতে বেরিয়ে আসছে গুহা থেকে। এবার ধরা পড়ে যাব নির্ঘাৎ। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ গুড়ুম করে কান ফাটানো শব্দ হল। পিস্তলধারী জলদস্যুটা গুলি করেছে মশালধারী সঙ্গীকে। তীক্ষ্ণ একটা মর্মভেদী আর্তনাদ, তারপর ধপাস করে আছড়ে পড়ল সামনের লোকটা। মাটিতে পড়েই দপ করে নিভে গেল মশাল। একরাশ স্ফুলিঙ্গের আলোয় দেখলাম মৃত্যু যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে মশালধারী!

দৌড় দিলাম। প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম গুলি এসে বিঁধবে পিঠে। কিন্তু হঠাৎ

BanglaBook.org

সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আমাকে দেখতেই পেল না পিস্তলধারী জলদস্যু। গুহামুখ থেকে গলে বেরিয়ে বেশ কিছুটা দূরে একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকলাম।

এক মিনিটের মধ্যেই নেভা মশাল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল জলদস্যুটা। বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক চাইল সে একবার, তারপর হাঁটতে শুরু করল তীরে বাঁধা নৌকোর দিকে। কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ উপর দিকে চাইল লোকটা। মাথার উপর গাছের ডালে কি দেখে দ্রুত পিস্তলে হাত দিল সে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল একটা চিতাবাঘ। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল লোকটাকে নিয়ে। মড়াৎ করে শব্দ পেলাম ঘাড় মটকানোর।

দৌড়াতে শুরু করলাম আমি। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ে চললাম। ঝোপঝাড়ে কেটে যাচ্ছে গা-হাত-পা। শিকড়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি মাঝে মাঝে, হাপরের মত হাঁপাচ্ছি, কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই আমার, আছড়ে পাছড়ে উঠে আবার দৌড়াচ্ছি। কতক্ষণ এভাবে দৌড়েছি বলতে পারব না। একটাই বোধ কাজ করছিল তখন আমার মনের মধ্যে—পালাতে হবে, পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

হঠাৎ সবকিছু নিরর্থক মনে হল। কি হবে দৌড়ে? এই গভীর জঙ্গলে কার কাছ থেকে কোথায় পালাচ্ছি আমি? আমি পাঁচশো বছর পরের মানুষ, এই অতীতে আমার কি ভূমিকা? কোথায় যাচ্ছি? কোথায় পৌঁছব গিয়ে?

পরিষ্কার উপলব্ধি করলাম, হারিয়ে গেছি আমি। আর কোনদিন ফিরতে পারব না আমি আমার যুগে। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের পরিচিত মুখগুলো ভেসে উঠল মনের পর্দায়। ভয়ানক অসহায় লাগল। হু-হু করে উঠল বুকের ভিতরটা। সবকিছু নিরর্থক। অতীতের এক ভয়ঙ্কর জঙ্গলে হারিয়ে গেছি আমি। একা!

বসে পড়লাম মাটিতে। মাথার মধ্যে দপদপ করছে। ধক্‌ধক্ করছে হৃৎপিণ্ডটা। অন্ধকার হয়ে আসছে চোখ। কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম বলতে পারব না, হিমেল এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল হঠাৎ, সমুদ্রের গর্জন মিলিয়ে গেল দূরে। সচকিত হয়ে দেখলাম, আগের সেই পরিচিত জঙ্গল! ফিরে এসেছি আমি আমার পরিচিত পৃথিবীতে! ঘুঘু ডাকছে নির্জন দুপুরে। একলাফে উঠে দাঁড়ালাম। চিনতে পারলাম জায়গাটা। গাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি আমি দৌড়ে।

ড্রাইভিং সিটে বসতে গিয়ে পিঠের ফোলা ব্যাগের অস্তিত্ব টের পেলাম। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। এক-এক করে ব্যাগ থেকে আটটা মোরগ বের করে রাখলাম পাশের সিটে। এদিক ওদিক কোথাও কুকুরটাকে দেখতে পেলাম না। বারকয়েক শিস দিয়ে ডাকলাম, তারপর ছেড়ে দিলাম গাড়ি।

বাংলোতে পৌঁছতেই হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল বুরুজ আলী, শুকুর, চৌধুরী সাহেব আর ড্রাইভার সালাম। আটটা মোরগ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল বুরুজ আলী। মোরগ-পোলাও হবে আজ। হিসেব করে ফেলল মুখে মুখেই—তিনটে দিয়ে মোরগ-পোলাও, দুটো রোস্ট, দুটো কালিয়া, একটা কোর্মা। প্রায় জোর করেই দাওয়াত নিল চৌধুরী সাহেব। মোরগ-পোলাও না খেয়ে আজ যাবে না সে কিছুতেই।

গোসল করে দূর হয়ে গেল সারাদিনের ক্লান্তি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চৌধুরী সাহেব অপেক্ষা করছে আমার জন্যে বসবার ঘরে। গরম চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসলাম সোফায় মুখোমুখি। মামুলি কথাবার্তা দিয়ে শুরু হল। লক্ষ্য করলাম কি যেন বলি বলি করছে চৌধুরী সাহেব।

খানিক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে বলেই ফেলল।

BanglaBook.org

'কিছু মনে করবেন না ইকবাল সাহেব, কুকুরটার ব্যাপারে আপনার প্রশ্ন এ কয়দিন কেন এড়িয়ে গেছি এখন বুঝতে পেরেছেন?'

'আপনার কথা বিশ্বাস করতাম না। তাই?'

'হ্যাঁ। কেবল তাই নয়, পাগল ঠাউরে বসতেন আমাকে।'

'ব্যাপারটা আসলে কি বলুন তো?'

'প্রায় ত্রিশ বছর আগে কুকুরটা ছিল এখানকার এক ইংরেজ ফরেস্ট অফিসার স্টিফেনসন সাহেবের। পাকা শিকারি ছিল সাহেব। কিন্তু ভারি বদরাগী। এই কুকুরটাকে ছোট থেকে যত্ন করে মানুষ করেছিল, থুড়ি, কুকুর করেছিল সাহেব। কিন্তু একদিন কি একটা ব্যাপারে ভয়ানক রেগে গিয়ে গলায় পা দিয়ে খুন করেছিল সে এই কুকুরটাকে। কিন্তু তাতেও রাগ যায়নি। গলায় রশি বেঁধে ঐ জঙ্গলের একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তারপর। যতদিন না পচে গলে খসে না পড়েছিল, ততদিন ঝুলেই ছিল কুকুরের লাশটা, কাউকে নামিয়ে আনতে দেয়নি সাহেব।'

'ভয়ানক লোক তো! স্যাডিস্ট।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই ফিরে এল কুকুরটা আবার। এবং সাতদিনের মধ্যেই বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেল সাহেব।'

'তারপর?'

'সেই থেকে কুকুরটা শিকারির জন্যে অপেক্ষা করে। নতুন যে ফরেস্ট অফিসার আসে তারই সাথে ভাব জমিয়ে তাকে শিকারে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে যায় কুকুরটা, তারপর হঠাৎ আকাশটা অন্ধকার হয়ে আসে, ঠাণ্ডা বাতাস বয়···হয়েছিল না এরকম?'

'হ্যাঁ।'

'অতীতের কোন একটা সময়ে নিয়ে যায় কুকুরটা শিকারিকে। তাকে শিকারি জীবনের সেরা আনন্দ দিয়ে ছেড়ে দেয়। শুধু একটা দিন। তারপর কোনদিন তাকে দেখা দেয় না আর।'

'শুধু একদিন?'

'হ্যাঁ। তাই তো শুনেছি সবার কাছে। ওটাকে আমি কিন্তু জীবনে দেখিনি। শুকুর বা বুরুজ আলীও না। আমরা শুধু ফরেস্ট অফিসারদের কাছে গল্প শুনি আর মোরগ-পোলাও খাই।'

চমৎকার গন্ধ আসছে রান্নাঘরের দিক থেকে। দারুণ বাবুর্চি বুরুজ আলী। পোলাওয়ের চাল, খাঁটি ঘি, কিসমিস, মটরশুঁটি, সালাদ, সিরকা সব জোগাড় করে রেখেছিল সে আমাকে শিকারে যেতে দেখেই। বিরিয়ানীর গন্ধে মউ মউ করছে চারদিক।

হেসে বললাম, 'কিন্তু চৌধুরী সাহেব, আমাকে আগেই সব খুলে বলতে পারতেন। প্রথমে অবিশ্বাস করলেও যখন সবকিছু ঘটছে তখন তো আর অবিশ্বাস করতে পারতাম না। আর কোনদিন যখন এ সুযোগ পাওয়া যাবে না, তখন আটটা না মেরে চার আটা বত্রিশটা মোরগ মেরে আনতাম।'

'খেপেছেন সাহেব? যদি ভয় পেতেন? তাহলে এই আটটাই বা আসতো কোত্থেকে? একবার বলেছিলাম এক ফরেস্ট অফিসার দীপেন গাঙ্গুলিকে। আর বলবেন না, ভদ্রলোক এমন ভয় পেলেন যে শিকারে কি যাবেন, সাতদিন সাতরাত অনবরত পাতলা পায়খানা। ইয়া মোটা দশাসই চেহারা ধসে গেল কয়েক দিনেই। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার নাম করে সেই যে গেলেন, একেবারে পগার পার। মোরগ-পোলাও আর হল

BanglaBook.org

না, সেবার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা।'

হাসলাম একপেট। এমন অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলেন চৌধুরী সাহেব যে না হেসে পারা যায় না।

'সেকালের মোরগ খেতে খুব ভাল বুঝি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তুলনা হয় না, সাহেব, তুলনা হয় না। এখুনি তো আসছে টেবিলে, খেয়ে দেখুন, ভুলতে পারবেন না জীবনে।'

পঞ্চদশ শতাব্দীর মোরগ আর বিংশ শতাব্দীর পোলাও, এই মিলে মোরগ-পোলাও। ভাবছিলাম, দেখা যাক খেয়ে কেমন লাগে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। চমকে উঠলাম ভিতর ভিতর। সত্যিই তো, একথা তো ভাবিনি আগে!

শিকারের ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হলেও আসলে বাস্তব সত্য। স্বপ্ন দেখিনি, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আটটা মোরগ। তাহলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের ব্যাপারটাও সত্যি। যা দেখে এসেছি সেটা সত্যিই ঘটেছিল পাঁচশো বছর আগে। দস্যু দু'জনই মারা পড়েছে আমার চোখের সামনে। নিজের চোখে দেখেছি আমি। তার মানে, ঐ গুপ্তধনের কথা এখন আমি ছাড়া আর কেউ জানে না! গুহাটা খুঁজে বের করতে পারব আমি অনায়াসে। ইচ্ছে করলেই মোহর ভর্তি বাক্সটা তুলে আনতে পারি আমি বালি খুঁড়ে। ...কিন্তু আর কেউ তুলে নিয়ে যায়নি তো!

কয়েকটা ব্যাপার জেনে নিতে হবে আমাকে। সতর্ক হয়ে গেলাম।

সাবধানে প্রশ্ন করলাম, 'অতীতের গল্প যা শুনেছেন, সবারটাই কি একই রকম?'

'না। তা কি করে হবে? একেকজন একেক দিকে যায়, একেক রকম দৃশ্য দেখে আসে। কেউ পঞ্চাশ বছর আগের অতীতে যায়, কেউ একশো, কেউ দু'শো। একজন আধজন আবার পাঁচশো বা হাজার বছর আগেও চলে যায়। কারও গল্পের সাথে কারও মিল নেই। আপনি কোন্ সময়টায় গেছিলেন?'

'আমি গেছিলাম পাঁচশো বছর আগে। ঐ পুবের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টায়। ওদিকটায় গিয়েছিল কেউ এর আগে?'

'অতদূরে সাধারণত কেউ যায় না। ঠিক মনে পড়ছে না গিয়েছিল কিনা। বেশির ভাগই যায় দক্ষিণের জঙ্গলে।'

বুঝলাম গুপ্তধন সম্পর্কে আর কারও জানতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। খুব সম্ভব আমি একাই দেখেছি ঐ দৃশ্য। তবু আরও কয়েকটা তথ্য জানা দরকার। কিন্তু এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যেন কেউ কিছু টের না পায়।

'আচ্ছা, চৌধুরী সাহেব, সবার গল্পই তো আপনি শুনেছেন। কেউ গণ্ডার বা চিতাবাঘের গল্প শুনিয়েছে?'

'হ্যাঁ, একজন। শাহাবুদ্দিন সাহেব। পশ্চিমের জঙ্গলে গণ্ডার দেখেছিলেন উনি।'

'আচ্ছা, মোরগ শিকারের পরদিনই আবার জঙ্গলে গেছে কেউ শিকার করতে?'

'না। একজনও না। সবাই দিন তিনেক ঘরে বসে থেকেছে ককেটার পথ চেয়ে। কেউ বিশ্বাস করেনি যে সত্যি সত্যিই জীবনে আর কোনদিন দেখা পাবে না ওটার। বন্দুক নিয়ে আশপাশের জঙ্গলে ঘুরঘুর করেছে কেউ কেউ মনমরা হয়ে। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে হয় কাজে, নয় বদলির চেষ্টায় মন দিয়েছে।'

দিগ্বিদিক্ ছুটল আমার বাঁধনহারা কল্পনা। নিশ্চিত হয়েছি, কেউ জানতে পারেনি গুপ্তধনের কথা। আমি যা দেখেছি তা কেউ দেখেনি আর।

টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে বুরুজ আলী আর শুকুর মিঞা। চারদিক অপূর্ব গন্ধে

BanglaBook.org

ভরপুর। আমরা টেবিলে গিয়ে বসলাম। মোরগের একটা ঠ্যাং তুলে নিয়ে কামড় বসাল চৌধুরী সাহেব।

'এবার আপনার গল্পটা শোনান, ইকবাল সাহেব।'

চমৎকার রান্না, অপূর্ব স্বাদ। কথা বলে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তবু খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গুপ্তধনের ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গিয়ে চিতাবাঘ ও গণ্ডারের একটা চমৎকার রোমহর্ষক গল্প শুনিয়ে দিলাম। খুশি মনে ঢেকুর তুলে চলে গেল চৌধুরী সাহেব।

জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, অপূর্ব সুন্দর চাঁদ উঠেছে ঐ পাহাড়টার মাথায়। ঘুমোতে পারব না আজ সারারাত। ভোরের অপেক্ষায় ছটফট করছি বিছানায় শুয়ে।

প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। কাল যাব আবার ওখানে, সবাইকে লুকিয়ে। হেঁটে। খুঁজে বের করবো গুহাটা। যদি গুপ্তধন পেয়ে যাই, তাহলে শতখানেক মোহর বের করে নিয়ে বাক্সটা আবার বালি চাপা দিয়ে চলে আসব। জিপে করে ঐ বাক্সটা এখানে নিয়ে আসা ঠিক হবে না, জানাজানি হয়ে যাবে। কালকেই রওনা হয়ে যাব ঢাকার উদ্দেশে। হেড অফিসে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে চাকরিতে রিজাইন দেব। তারপর মোহরগুলো ভাঙিয়ে একটা ফোক্সওয়াগেন··· না···টয়োটা গাড়ি কিনে নেব। রেজিস্ট্রেশন, ইনশিওরেন্স, ট্যাক্স টোকেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি করতে কয়েক দিন সময় যাবে। কিন্তু এই সময়টা ব্যয় করা দরকার। বেআইনী গাড়ি চালানোর দায়ে গুপ্তধনসহ ধরা পড়তে চাই না পুলিসের হাতে। সব ঠিকঠাক করে নিজের গাড়িতে চড়ে ফিরে আসব আমি এখানে, একা। হিসেব করে দেখেছি, বিশ তারিখের আগে কিছুতেই পৌঁছতে পারব না এখানে, পাঁচশ বছর ধরে বালির নিচে আছে, আর দশটা দিন থাকতে তেমন কষ্ট হবে না মোহরগুলোর।

বিশ তারিখে আসছি আমি ফিরে। তারপর আমি রাজা!

হুররে!

ইকবালের ডায়েরী এখানেই শেষ।

নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে গুপ্তধন পেয়েছিল সে, নইলে হঠাৎ করে ঢাকায় ফিরে চাকরি ছেড়ে দিল কেন খামোকা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে? একশোটা মোহর নিয়ে ঢাকায় চলে গেছে ও—নিশ্চয়ই বাকিগুলো রয়ে গেছে ঐ গুহার মধ্যেই?

আজ আঠারোই জানুয়ারি। আগামী পরশু আসবে ও। মাঝে শুধু একটা দিন।

আচ্ছা, আরেকজনের পাওয়া জিনিস নিয়ে নেয়া কি ঠিক? মানে, কাজটা কি খুব অন্যায় হয়ে যায়?

কিন্তু জিনিসটা কোন্ হিসেবে ইকবালের? পর্তুগীজ জলদস্যুদের গুপ্তধন—হঠাৎ কপালগুণে দেখে ফেলল ইকবাল, তাই বলে ওগুলো যদি ইকবালের হয়, তাহলে এই যে আমি—হঠাৎ কপালগুণে দেখে ফেলেছি ইকবালের ডায়েরী, ওগুলো আমারই বা হবে না কেন? নাহয় অর্ধেক দিয়ে দিলাম ওকে। ঠিক, তাই করব।

এর মধ্যে কাজ সেরে চলে যায়নি তো ইকবাল?

ঘুম হবে না আমার আজ রাতে।

খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ উঠেছে পুবের ঐ রহস্যময় পাহাড়ের মাথায়। ঐ এলাকাটা আমারও চেনা। আমিও কুল খেয়েছি ঐ জংলী কুলগাছের। আমিও দেখেছি ঐ পাথরটা।

BanglaBook.org

ভয়াল দ্বীপ

তাজ্জব হয়ে চেয়ে রয়েছে আলতাফ মির্জা।

ঘাড়ের পিছনে কড়া রোদের আঁচ লাগছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিন মানুষ সমান উঁচু মসৃণ প্রাচীরের একটা খাঁজ দু'হাতে আঁকড়ে ধরে চোখ রেখেছে ফুটোটায়। স্তব্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

বিশাল ঈজিয়ান সাগরের ধু-ধু নীলের মাঝখানে নগণ্য একটা বিন্দুর মত ছোট্ট দ্বীপটা। গত দেড়টি মাস যে আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপে দ্বীপে, যার খোঁজে হন্যে হয়ে চষে ফেলেছে লেসবস, চিওস, স্যামোস, আর সিক্লেডিসের দ্বীপপুঞ্জ, ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছে আলতাফ। দেয়ালের ওপারে।

দেয়ালের পরেই বাগান। বাগানের মধ্যে একটা ফোয়ারা জল ছিটাচ্ছে শান্ত ভঙ্গিতে। ফোয়ারার মাঝখানে দুটি নগ্ন মূর্তি। মা ও সন্তান।

আশ্চর্য দু'টি মূর্তি। হেলিওট্রোপ, জেসপার বা অন্য কোন দামি পাথরে খোদাই করা মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক কি পাথর, ঠাহর করতে পারছে না ওর অভিজ্ঞ চোখও। আসলে চমকে গিয়েছে ও এই আকস্মিক আবিষ্কারে।

পকেট থেকে পেনসিলের মত একটা ছোট্ট জিনিস বের করে টেনে লম্বা করল। টেলিস্কোপের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ওটা চোখে লাগিয়ে সত্যি সত্যিই লাফ দিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ডটা, দ্বিগুণ বেগে চলছে এখন হার্টবিট। কী আশ্চর্য সূক্ষ্ম হাতের কাজ। একেবারে নিখুঁত। মাথাটা সামান্য একটু কাৎ হয়ে আছে, চোখ দুটোতে ঈষৎ বিস্ময়। অপূর্ব!

অভিজ্ঞ ভাস্করের চোখ দিয়ে পরীক্ষা করল আলতাফ মূর্তি দুটো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আগাগোড়া। যত দেখছে ততোই বাড়ছে বিস্ময়। কিন্তু কিছুতেই নির্মাণ-কালটা আঁচ করতে পারছে না। ভাস্করটিকেও ঠিক চেনা যাচ্ছে না। খুবই প্রাচীন হতে পারে, একেবারে সেই গ্রীক সভ্যতার উন্মেষ যুগের, কিংবা তারও আগের—আবার গতকালকের ভাস্কর্য বলেও চালানো যেতে পারে একে। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও,

BanglaBook.org

পৃথিবীর কোন ক্যাটালগেই উল্লেখ নেই এর। কোথাও দেখেনি ও এই মূর্তির ছবি।

নেহাত কপালগুণে পেয়ে গেছে আলতাফ দ্বীপটা। বাংলাদেশ থেকে স্কলারশিপ নিয়ে তিন বছরের জন্যে এথেন্সে এসেছে ও ভাস্কর্য পড়তে। দু'বছরে শিখে ফেলেছে এদেশের ভাষা। গড় গড় করে বলতে পারে এখন। ফলে সহজ হয়ে গেছে ওর গতিবিধি, গ্রীসের যে-কোন জায়গায় ঘুরতে ফিরতে অসুবিধে নেই আর। দু'মাসের ছুটি পেয়েই বেরিয়ে পড়েছে তাই। ঘুরছে এই পৌরাণিক সাগরের দ্বীপে দ্বীপে। এককালে এসব দ্বীপে মানুষের মতই চলাফেরা করত গ্রীক দেব-দেবীরা। এই সব প্রাচীন দ্বীপে মাটির নিচ থেকে এখনও হঠাৎ করে পাওয়া যায় এক-আধটা সে-কালের ভাস্কর্যের নমুনা। আলতাফ এসেছে সেই লোভে—যদি পেয়ে যায় কিছু।

একটা লক্কড়ে গ্রীক মোটর-বোটে উঠেছিল ও গত রাতে এক অখ্যাত দ্বীপ থেকে। অনির্দিষ্টভাবে এ-দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপে মাল ও যাত্রী বহন করাই এই বোটের কাজ। মাঝরাতের দিকে ছোটখাট একটা ঝড়ের মুখে পড়ে হাল ছেড়ে দিল ক্যাপ্টেন। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ভেসে গেল ওরা ঝড়ের ঠেলায়। ঘন্টা তিনেক পর ঝড় থেমে যেতেই আবার প্রাণ ফিরে এল ইঞ্জিনে, ধুঁকতে ধুঁকতে এগোল আবার ধীর গতিতে। বাতাসের ঠেলায় কতদূর সরে এসেছে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু সেজন্যে কোনরকম দুশ্চিন্তাও নেই ক্যাপ্টেনের। নির্বিকার। গোটা ঈজিয়ান সাগর তার নখদর্পণে, মোটামুটি উত্তর-পুব দিকে মুখ করে রওনা হয়ে গেল গদাইলশকরী চালে।

সকালে উঠে জানা গেল গতিপথ থেকে প্রায় সত্তর-আশি মাইল সরিয়ে দিয়েছে ওদের গত রাতের ঝড়, ভাড়া এক ড্র্যাকমা বেশি দিতে হবে। রাজি হয়ে একটা ডেক চেয়ারে বসে নাস্তা সারল আলতাফ। যতদূর চোখ যায় নীল আর নীল। নির্মল, নির্মেঘ আকাশে নিঃশব্দে উড়ছে সী-গাল। ইঞ্জিনের অস্পষ্ট মৃদু ধুক-ধুক শব্দ। ছোট-ছোট ঢেউয়ের ছল-ছলাৎ। সাগরের দোল-দোল-দুলুনি। মৃদু সোঁদা হাওয়া।

কফির কাপে চুমুক দিয়েই চোখ পড়ল ওর এই দ্বীপটার উপর। ছোট্ট একটা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। দূরবীনটা চোখে লাগাতেই এক লাফে অনেকখানি কাছে চলে এল দ্বীপটা। আশ্চর্য! দেয়াল কিসের? পরিষ্কার দেখতে পেল আলতাফ, পাথরের তৈরি বিশাল এক প্রাচীর উঠে এসেছে সমুদ্র থেকে, ছোট্ট দ্বীপের বেশ কয়েক একর জমি গোল করে ঘিরে আবার নেমে গেছে সমুদ্রে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে সাদা ফেনা উঠছে ঢেউয়ের মাথায়।

ব্রিজের দিকে চলেছিল ক্যাপ্টেন, ডাক দিল আলতাফ। আঙুল তুলে দেখাল। 'ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। ঐ··· যে।'

বিদেশীর মুখে চমৎকার গ্রীক শুনে একগাল হাসল ক্যাপ্টেন। বলল, 'তাই নাকি? কই?'

দূরবীনটা এগিয়ে ধরল আলতাফ। 'ঐ···ত্তো। প্রকাণ্ড একটা দেয়াল দেখা যাচ্ছে ওখানে!'

মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের মুখের হাসি। ঝট করে ঘাড় ফিরাল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অন্যদিকে চেয়ে ফিরিয়ে দিল দূরবীনটা।

'ও কিছু না। গোটা কয়েক চাষাভুষো থাকে ওখানে। গরু-ছাগল চরায়।'

'কিন্তু ঐ দেয়ালটা কিসের? দেখুন না।'

আবার দূরবীনটা গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল আলতাফ ক্যাপ্টেনের হাতে, কিন্তু হাত মুঠো করে রেখেছে ক্যাপ্টেন, কিছুতেই নিল না।

BanglaBook.org

'না!' একচুল নড়াল না ঘাড়। কিছুতেই চাইল না দ্বীপটার দিকে। বলল, 'ও একটা পুরানো দিনের ধ্বংসাবশেষ। কিছুই নেই দেখবার মত। বোট ভিড়াবার ব্যবস্থাও নেই। বাইরের কেউ যায় না ওখানে বহু বছর। ভাল লাগবে না আপনার। ইলেকট্রিসিটি নেই। প্রাচীনকালের ভগ্নাবশেষ একটা।'

হাসল আলতাফ। 'ভগ্নাবশেষই তো খুঁজছি আমি। দেখতে চাই কি আছে ওর ভেতর।'

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চাইল ক্যাপ্টেন আলতাফের দিকে। চট করে সরিয়ে নিল চোখ। অমায়িক ভদ্রতার লেশমাত্র নেই সে দৃষ্টিতে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভয়ানক বিরক্ত হয়েছে সে ওর উপর। কর্কশকণ্ঠে বলল, 'বলছি তো কিছুই নেই ওখানে! এতই নগণ্য যে নাম পর্যন্ত নেই দ্বীপটার। হাজার হাজার বছরের পুরানো ঐ দেয়াল। কেউ নেই ওখানে।'

'আমি নিজ চোখে দেখতে চাই,' সিদ্ধান্তে অটল রইল আলতাফ।

শেষ পর্যন্ত ওকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হল ক্যাপ্টেন। কিছুটা কাছে এসে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল মোটর-বোট, একটা ডিঙিতে করে পৌঁছে দেয়া হল ওকে দ্বীপে। তীরের কাছাকাছি এসেই দেখতে পেল আলতাফ, নির্জন একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে গ্রামের ঝিম ধরা বাড়িগুলোর দিকে, রাস্তার পাশে সরাইখানা দেখা যাচ্ছে একটা, পঞ্চাশ-ষাটটা ছাগল চরছে পাহাড়ের গায়ে, গোটা কয়েক মাছ ধরার নৌকো বাঁধা রয়েছে খুঁটির সাথে। সব মিলে কেমন একটা ক্লান্ত, অবসন্ন ভাব।

ফিরে যাবে কিনা ভাবল একবার আলতাফ। ক্যাপ্টেনের কথাই হয়ত ঠিক। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া প্রাচীন একটা গ্রাম, গোটা কয়েক সাদামাঠা সরল গ্রাম্য লোক, নামহীন নগণ্য এক দ্বীপ—গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলোতেও নিশ্চয়ই এমনি অখ্যাত, অবহেলিত ছিল এ দ্বীপ, নইলে কোথাও না কোথাও এর নামের উল্লেখ থাকত। পরমুহূর্তে প্রকাণ্ড প্রাচীরটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। না, ভুল করেনি ও। প্রাচীর তৈরি হয় বাধা দেয়ার জন্যে। কাউকে এর ভিতর ঢুকতে অথবা এখান থেকে বেরোতে বাধা দিতে চেয়েছে এর নির্মাতা। কাকে? দেখা দরকার।

সরাইখানায় সুটকেসটা নামিয়েই রওনা হয়ে গেছে ও প্রাচীর লক্ষ্য করে। কিন্তু আশ্চর্য, গেট পেল না কোথাও। ভিতরে ঢুকবার বা বেরোবার ব্যবস্থা নেই। মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরি দুর্ভেদ্য এক জেলখানা মনে হচ্ছে। সমুদ্র থেকে উঠে মিলিয়ে গেছে আরেক পাশের সমুদ্রে। কি আছে ওপারে?

এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে কেমন যেন বোকা হয়ে গেল আলতাফ। ব্যাপার কি! হঠাৎ মনে হল, নিশ্চয়ই গুপ্তপথ রয়েছে দেয়ালের গায়ে কোথাও না কোথাও, তাড়াহুড়োয় লক্ষ্য করেনি ও! কথাটা মনে হতেই আবার হাঁটতে শুরু করল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে দেয়ালের গায়ে কোন ফাটল বা গর্ত চোখে পড়ে কিনা। চলতে চলতে হঠাৎ মিষ্টি একটা কুলকুল ধ্বনি কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়েছে আলতাফ, ছোট্ট ফুটোটা দেখতে পেয়ে উঁচু হয়ে চোখ রেখেছে সেখানে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত আলতাফ চোখ সরাতে পারছে না মূর্তি দুটোর উপর থেকে। এমন অপূর্ব সৃষ্টি জীবনে দেখেনি ও আর। শিউরে-শিউরে উঠেছে ওর শরীরটা থেকে-থেকে বিরাট এক শিল্পীর আশ্চর্য কলানৈপুণ্য দেখে। তুলনাহীন। এক কথায় মহৎ।

এত আশ্চর্য একটা সৃষ্টি—অথচ কোথাও এর কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই কেন? এমন জিনিস চাপা থাকতে পারে না। চাপা থাকার জিনিস নয় এসব। অথচ এতটুকু টুঁ শব্দও নেই! বাইরের কারও কানে গেল না, কেউ জানল না এতবড় খবরটা এতদিন—এ কেমন

BanglaBook.org

কথা! এখানে, এই ঈজিয়ান সাগরের এক অখ্যাত নামহীন দ্বীপে আশ্চর্য এক ভাস্করের মা ও ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্বাক, কত হাজার বছর ধরে কে জানে!

চেয়ে রয়েছে আলতাফ। চোখ ফিরাতে পারছে না। তৃষ্ণা মিটছে না কিছুতেই। দেখছে, সেই সাথে ভাবছে, যে করে হোক সংগ্রহ করতে হবে এটা। সারা দুনিয়া চমকে উঠবে ওর আবিষ্কারে। ঢিব ঢিব করছে বুকের ভিতরটা। পাওয়া যাবে তো! নিজেকে শাসন করল আলতাফ, এত উত্তেজিত হওয়া ঠিক হচ্ছে না। খুব সম্ভব এই ঘেরা জায়গাটার মালিক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এ সম্পত্তি, মূর্তি দুটোর সত্যিকার মূল্য নিরূপণের কথা ভাবেইনি হয়ত কোনদিন, পড়ে আছে ওগুলো যেমন ছিল তেমনি, অনাদৃত, অবহেলিত। বেশি আগ্রহ প্রকাশ হয়ে পড়লে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে ব্যাটা, হয়ত বিরাট দাম হেঁকে বসবে, সাধ্যের বাইরে চলে যাবে ওর। এমনভাবে পাড়তে হবে কথাটা, যেন পেলে ভাল, না পেলে ক্ষতি নেই।

বহু কষ্টে চোখ সরাল আলতাফ। আবার হাঁটতে শুরু করল দেয়াল ঘেঁষে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল দেয়ালটা আগাগোড়া। নাহ্। কোন পথ নেই ওপাশে যাওয়ার। শেষ মাথায় বাঁকা হয়ে নেমে গেছে বিশাল প্রাচীর সমুদ্রের নিচে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে, সাদা ফেনা উঠছে।

ধীর পায়ে ফিরে চলল আলতাফ সরাইখানার দিকে। গ্রামের লোকদের কাছে নিশ্চয়ই জানা যাবে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে ঘেরা জায়গাটার মালিকের সাথে। প্রাচীন দ্বীপের গায়ে হাজার হাজার বছরের স্মৃতি বুকে নিয়ে জমে আছে পুরু ধুলো, তার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গ্রীক সভ্যতার কত শত টুকরো গৌরবের কথা মনে আসছে আলতাফের, কিন্তু ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে বার বার ফিরে আসছে ওর চোখের সামনে মা ও সন্তানের মূর্তি দুটো। নিখুঁত। বিরাট কোন শিল্পীর অনবদ্য সৃষ্টি। কে সে?

আলতাফ আশা করেছিল, বিদেশী লোক এসেছে খবর পেয়ে ভিড় করে আসবে সারা গ্রামের লোক ওকে দেখতে, অতিষ্ঠ করে তুলবে হাজারটা প্রশ্ন করে, অবাক হয়ে যাবে ওর মুখে পরিষ্কার গ্রীক শুনে—কিন্তু কোথায়? বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখতে পেল না ও কারও মধ্যে। কয়েকটা চেয়ার টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে কয়েকজন, নিরুৎসুক, নির্বিকার দৃষ্টিতে দেখল ওকে, ফিরিয়ে নিল চোখ।

'জুতো পালিশ?'

আলতাফের ধূলি-মলিন জুতোটার দিকে দেখাল একটা বাচ্চা ছেলে আঙুল তুলে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই ঝটপট লেগে গেল কাজে। মাটিতে লেপটে বসে এক মনে ব্রাশ করছে সে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে।

একটা বেঞ্চির উপর বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আলতাফ ছেলেটাকে। বছর পনের বয়স, জীর্ণ একটা তালি দেয়া শার্ট গায়ে, কিন্তু চেহারাটা সেই সনাতন আদি ও অকৃত্রিম গ্রীক। খাড়া নাক, সুন্দর কপাল, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, দুইগাছি চুল এসে পড়েছে কপালে গোল হয়ে। রাখাল দেবতা প্যানের শিঙের মত লাগছে। হঠাৎ ভুল হয়ে যায়, মনে হয় প্রাচীন কোন মূর্তির দিকে চেয়ে আছি। কিন্তু না, এ থেকে মডেল করে মূর্তি গড়ত না প্র্যাকসিটেলিস কোনদিনই। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত একটা কাটা দাগ রয়েছে ছেলেটার, উপরের ঠোঁটটা সামান্য একটু উঁচু হয়ে রয়েছে এর ফলে, চকচকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে ফাঁক দিয়ে। নিখুঁত নয়। খোঁচ-কাটা প্যান।

'ঐ দেয়ালের ওপাশে জায়গাটা কার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আলতাফ ছেলেটিকে।

কাজ থামিয়ে চট করে ওর দিকে চাইল ছেলেটা। বিস্মিত দৃষ্টি। চোখ সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল।

'তোমার তো জানার কথা।' বলল আলতাফ একটু অবাক হয়ে। 'ঐ যে ঘেরা জায়গাটা। বিরাট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, একেবারে সাগরে গিয়ে মিশেছে…'

আবার মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'ওটা চিরকালই আছে ওখানে।'

হাসল আলতাফ। 'চিরকাল তো অনেক লম্বা সময় হয়ে গেল, হে। এখন কে আছে?' ছেলেটাকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখে বলল, 'তোমার বাবা বলতে পারবেন হয়ত?'

'আমার বাপ-মা নেই। আমি একা,' কাজে মন দিল ছেলেটা আবার।

খানিকক্ষণ চুপচাপ ছেলেটার দক্ষ হাতের কাজ দেখল আলতাফ, তারপর বলল, 'ওখানে কারা থাকে সত্যিই জান না তুমি?'

নিচু গলায় একটা নাম বলল ছেলেটা।

'গর্ডন?' সামনের দিকে ঝুঁকে এল আলতাফ। 'কি বললে? গর্ডন? কোন ইংরেজ ফ্যামিলি?' টের পেল আলতাফ, নিভে আসছে ওর আশার প্রদীপ। ইংরেজ হলে সহজ হবে না ভজানো।

'না ইংরেজ না।'

আবার আশার আলো দেখতে পাচ্ছে আলতাফ। বলল, 'ওদের সাথে দেখা করার উপায় কি বল তো?'

'কোন পথ নেই,' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'জানি,' বলল আলতাফ। 'দ্বীপের এদিক থেকে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই, আমি জানি। কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা আছে? ডক বা ঐ রকম কিছু…

চোখ নিচু করে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

জনা কয়েক লোক জমে গেছে আশপাশে। দেখছে ওকে, চুপচাপ শুনছে কথাবার্তা। সাধারণত গ্রীকরা হাসিখুশি, মিশুক হয়—দেখেছে আলতাফ। কৌতূহলী প্রশ্ন, পরামর্শ আর উপদেশ দিয়ে অস্থির করে তোলে অচেনা মানুষকে। কিন্তু এরা যেন কেমন। কারও মুখে কোন কথা নেই, হাসি নেই; চুপচাপ দেখছে ওকে, শুনছে কথা।

কাজ শেষ হলে একখানা পঞ্চাশ-লেপ্টা মুদ্রা ছুঁড়ে দিল আলতাফ ছেলেটির দিকে। খপ করে ক্যাচ ধরল ছেলেটা, যা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে হাসল মিষ্টি করে। ঠোঁট-কাটা প্যান।

দর্শকদের দিকে ফিরল আলতাফ, একজন বয়স্ক লোক বেছে নিয়ে বলল, 'ঐ দেয়ালের ওপাশে যে জায়গাটা, ওটার মালিকের সাথে একটু দেখা করতে চাই।'

কি যেন বিড়বিড় করল লোকটা বোঝা গেল না। দ্বিতীয় প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল পিছন ফিরে। নিজের ভুল বুঝতে পারল আলতাফ। প্রথমেই পয়সার কথা বলা উচিত ছিল। বুড়ো বিদায় নেয়ার সাথে-সাথেই নড়ে উঠেছে আর সবাই। চট করে বলল, 'কেউ যদি নৌকোয় করে আমাকে দেয়ালের ওপাশে পৌঁছে দেয় তাহলে পঞ্চাশ—না, একশো ড্র্যাকমা দেব।'

আলতাফ জানে ওদের হিসেবে এটা অনেক টাকা। সারা বছরের পরিশ্রমেও ওরা একশো ড্র্যাকমা উপার্জন করে কিনা সন্দেহ। অনেক টাকা। কিন্তু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা, তারপর একটি কথা না বলে, একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে চলে গেল। সবাই।

তবু হাল ছাড়ল না আলতাফ। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। সারাটা গ্রামে একই রহস্যময় নীরবতা। প্রাচীরটার মতই দুর্লঙ্ঘ্য। ব্যাপারটা কি! দেয়ালের প্রসঙ্গ এলেই সব চুপ। কে বানিয়েছে ওটা, কবে বানিয়েছে, কি আছে ওপারে, কিছুই জানা গেল না।

BanglaBook.org

যেন দেয়ালটার কোন অস্তিত্বই নেই ওদের জীবনে।

সন্ধের দিকে ফিরে এল ও সরাইখানায়। খেয়ে নিল ডোলমাডাকিস। ভাতের মধ্যে ডিম আর খাসির মাংসের টুকরো ছেড়ে দিয়ে গরম মসলা দিয়ে রান্না। খুবই সুস্বাদু খাবার। কিন্তু মুখে রুচি নেই আলতাফের। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে দেয়ালের ওপাশে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে মা, কোলে সন্তান—অন্ধকার নামছে ওদের চারপাশে। ওগুলো পাওয়ার অদম্য বাসনা কিছুতেই পূরণ হচ্ছে না বলে আশ্চর্য এক বিষাদে ছেয়ে গেছে ওর মন।

ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত কলহ-বিবাদ বিধি-নিষেধ অনেক দেখেছে আলতাফ। এসব খুব আছে এদের মধ্যে। এ-দল ও-দলের মুখ দেখে না, ও-দল এ-দলের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না, বংশ পরম্পরায় চলে ঝগড়া-ফ্যাসাদ-কোন্দল। ওদের কাছে এইসব আঁকড়ে ধরে মন কষাকষি জিইয়ে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সাদামাঠা গ্রাম্য জীবনে এসব ছাড়া আছেই বা কি আর। কিন্তু এই চুপ করে যাওয়াটা ঠিক সে রকম যেন মনে হচ্ছে না ওর কাছে। একটু যেন অন্য রকম। অন্য কিছু। কি?

ঘুমিয়ে পড়েছে দ্বীপের সবাই। কোথাও কোন বাতির চিহ্ন নেই। শুধু দপ দপ করছে আকাশ-ভর্তি তারা।

তারাজ্বলা আকাশের নিচে সাগর তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ ভাঙার একঘেয়ে শব্দ শুনছে আলতাফ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। খসখস শব্দ হল পিছনে। চমকে ঘাড় ফিরাল আলতাফ। বাচ্চা একটা ছেলে আসছে এদিকে। সেই জুতো-পালিশ-করা ছেলেটা। চোখ দুটো চকচক করছে তারার আলোয়।

'আ-আমি নিয়ে যাব আপনাকে,' চাপা ফিসফিসে গলায় বলল ছেলেটা। 'ন্-নৌকা করে।'

খুশি হয়ে উঠল আলতাফ। হাসল ছেলেটার ভয় দেখে। গোষ্ঠীগত বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙোতে ভয়ও পাচ্ছে, ওদিকে আবার, বাপ-মা হারা ছেলে, লোভও সামলাতে পারছে না একশো ড্র্যাকমার। যাই হোক, ওর কাজ হলেই হল। হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটার দিকে। 'থ্যাংকিউ! কখন রওনা হতে চাও?'

বরফের মত ঠাণ্ডা ছেলেটার হাত। কাঁপছে। বলল, 'ভাটার আগে দিয়ে—সূর্য ওঠার এক ঘন্টা আগে,' কিন্তু, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ছেলেটার খটাখট, 'কিন্তু···নিয়ে যাব, কিন্তু দেয়ালের ওপাশে ঐ পাহাড়টার ওধারে আমি যাব না। ও-ওইখানেই নামতে হবে আপনাকে। ভাটার পর পানি সরে গেলে হেঁটে···হেঁটে··· প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে থেমে গেল ছেলেটা।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আলতাফ। 'অনধিকার প্রবেশের সমস্ত দায়িত্ব আমার। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। অবশ্য আমার মনে হয় না···'

ঠাণ্ডা হাতে খপ করে ধরল ছেলেটা আলতাফের হাত। 'কাউকে বলবেন না তো? সরাইখানায় ফিরে—আমি যে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি···'

'ঠিক আছে, তোমার আপত্তি থাকলে বলব না কাউকে।'

'না, বলবেন না! ওরা রেগে যাবে, যদি টের পায়···পরে, যে আমি আপনাকে··· কোনরকম আভাস···'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি। বলব না কাউকে। এমন আভাসও দেব না যাতে ওরা সন্দেহ করতে পারে যে তুমিই নিয়ে গেছ আমাকে। এই তো?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' একটু চুপ করে থেকে বলল। 'সূর্য ওঠার ঠিক এক ঘন্টা আগে। পুব দিকে দেয়ালটা যেখানে সাগরে মিশেছে, সেইখানটায় আসব আমি।'

'অত ঘুরতে যাবে কেন?' অবাক হল আলতাফ। 'পশ্চিম দিকে হলে সুবিধে হত না তোমার?'

'না! দেখে ফেলবে। মাছ ধরার নাম করে ঘুরে আসব··· ওপাশ দিয়ে।'

ছোট্ট একটা ডিঙি-নৌকোয় বসে ঢেউয়ের মাথায় দুলছে ছেলেটা। আকাশ ভর্তি অসংখ্য তারা জ্বলছে এখনও, কিন্তু একটু ফ্যাকাসে। চলার গতি বাড়িয়ে দিল আলতাফ। হঠাৎ বুঝতে পারল, কমপক্ষে তিনটে ঘন্টা একটানা দাঁড় বাইতে হয়েছে ছেলেটাকে পুরো দ্বীপ ঘুরে এতদূর আসতে। পালের কোন ব্যবস্থা নেই ডিঙিতে।

উঠে পড়ল আলতাফ। রওনা হল ওরা। একটা কথাও বলল না ছেলেটা।

ভোর হওয়ার আগে ঠাণ্ডা একটা বাতাস ছেড়েছে, ফলে সমুদ্রের বুকে অশান্ত ঢেউ। প্রাচীরের আড়াল থেকে খোলা সমুদ্রে বেরোতেই একসাথে বাতাস ও ঢেউয়ের ঝাপ্টা খেল ডিঙি। কিন্তু পাকা হাতে সামলে নিল ছেলেটা। ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগোল ডিঙি ধীর গতিতে।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ভাটার টানে নেমে যাচ্ছে পানি, ছোট ছোট গোটা কয়েক এবড়োখেবড়ো পাথুরে টিলা জেগে উঠেছে পানির উপর। ভেজা। সেইদিকেই এগোচ্ছে ডিঙিটা। প্রাচীরটার দিকে চাইল আলতাফ। এখান থেকে আরও বিশাল, আরও দুর্লঙ্ঘ্য মনে হচ্ছে ওটাকে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কে বানিয়েছে এই দেয়াল?'

'পুরাকালের ওরা,' বলল ছেলেটা। শীতে বা ভয়ে কাঁপছে ও। দেয়ালটার দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে ও সর্বক্ষণ, দাঁড় বাইছে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। 'সব সময়েই আছে ওটা। চিরকাল।'

চিরকাল। এটা একটা কথার কথা। কিন্তু ভোরের প্রথম আলোয় এপাশ থেকে দেয়ালটা দেখে হঠাৎ উপলব্ধি করল আলতাফ সত্যিই খুব প্রাচীন এ দেয়াল। খুবই প্রাচীন। গ্রীক সভ্যতার একেবারে আদি যুগের হওয়াও বিচিত্র নয়। তাহলে মূর্তি দুটো? ব্যাপারটা কেমন হেঁয়ালী মনে হচ্ছে ওর কাছে। স্বপ্নের মত। এত প্রাচীন একটা জিনিস এতদিন পৃথিবীর কারও চোখে পড়ল না, কেউ জানল না—আবিষ্কার করে বসল বিংশ শতাব্দীর এক বাঙালী শিল্পী আলতাফ মির্জা! কেমন উদ্ভট নয়?

ধীরে ধীরে যতই কাছে এগোচ্ছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে আলতাফ, পৃথিবীর কারও চোখে পড়েনি, ওরই চোখে পড়েছে কেবল, এমন হতেই পারে না। অসম্ভব। প্রথম একশো জনের মধ্যেও সে আছে কিনা সন্দেহ। এটা নামহীন এক অখ্যাত দ্বীপ হতে পারে, কিন্তু বহু বহু বছর ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ দেয়ালটা, অটল, অনড়—নিশ্চয়ই ওরই মত কৌতূহলী হয়ে আরও অনেক লোক এসেছে এই দ্বীপে। অনেক লোক। অথচ এত মহৎ একটা শিল্প সম্পর্কে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই!

একটা টিলার গায়ে এসে ঠেকল ডিঙি। প্রকাণ্ড একটা কালো পাথরের সাথে ঘষা খাচ্ছে ঢেউয়ের দোলায়। পাথরের উপরটা সাদা হয়ে আছে পাখির বিষ্ঠায়। আবছা আলোয় ধবধব করছে সেটা। বৈঠা রেখে দিল ছেলেটা পাটাতনের উপর।

'জোয়ার এলে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব আমি আপনাকে,' দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রবল জ্বরে কাঁপছে। 'টাকাটা এখন দেবেন?'

'নিশ্চয়ই,' মানিব্যাগটা বের করল আলতাফ হিপ পকেট থেকে। 'কিন্তু এখানেই ছেড়ে দেবে? আর একটু এগিয়ে দেবে না?'

'না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ছেলেটা। 'বলে নিয়েছি আমি, আর পারব না। পানি সরে যাবে…'

'এদের ডকটা কোথায়?' এদিক ওদিক চাইল আলতাফ। টিলা থেকে তীরটা অল্পই দূর। শ'দেড়েক গজ হবে বড় জোর। আগাগোড়া পুরোটা তীরের ছোট্ট ঢালু বালুকা-বেলার উপর চোখ বুলিয়ে অবাক হল ও। 'আরে! ডক নেই তো!'

দেয়ালের এপাশে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, আর মাঝেমধ্যে এক আধটা এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঁই বা টিলা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এখানে-সেখানে বেড়ে উঠেছে প্রকাণ্ড সাইপ্রেস। ছেলেটার দিকে ফিরল আলতাফ।

'শোন, এক কাজ করা যাক। তুমি এখানটায় থাক, আমি তোমার ডিঙিটা নিয়ে যাই। বেশি দেরি হবে না। মালিকটার সাথে দেখা করে দুটো মূর্তির ব্যাপারে কথা বলেই…'

'না!' আঁৎকে উঠল ছেলেটা। 'আপনি ডিঙি নিয়ে গেলে…' কথাগুলো বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা, সামনে ঝুঁকে দু'হাত বাড়াল পাথরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডিঙিটা সরিয়ে নেয়ার জন্যে। ঠিক সেই সময় একটা ঢেউয়ের দোলায় উঁচু হয়ে গেল ডিঙি বেশ খানিকটা, তারপর হঠাৎ ঝপ করে নেমে গেল নিচে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ছেলেটা। হাত দুটো ধরার মত কিছু খুঁজল শূন্যে, ঘুরে গেল শরীরটা, ঠাশ করে পড়ল মাথা পাথরের উপর। বালির বস্তার মত তলিয়ে যাচ্ছে পানির নিচে।

খপ করে ওকে ধরে ফেলার চেষ্টা করল আলতাফ, কিন্তু ফসকে গেল হাত। সাথে সাথেই ঝাঁপ দিল সে। কয়েক ফুট নিচে পাথরের চাঁইয়ের একটা চোখা অংশ দিয়ে জোর গুঁতো খেল বুকে। আরও কয়েক ফুট নিচে নেমে ছেলেটার শার্ট ধরে টান দিল। ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল শার্ট খবরের কাগজের মত। খপ করে চুল ধরল এবার, টেনে তুলে আনল উপরে। এদিক ওদিক চাইল আলতাফ। নৌকোটা নেই। ঝাঁপ দেয়ার সময় পায়ের ধাক্কা খেয়ে দূরে সরে গেছে। অন্য কোন টিলার গায়ে আটকে আছে হয়ত। এখন ওটাকে না খুঁজে ছেলেটাকে ডাঙায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

বাংলাদেশের ছেলে—সাঁতারে অভ্যস্ত, অনায়াসে পারে নিয়ে এল আলতাফ ছেলেটার জ্ঞানহীন দেহ। তীরে উঠতেই দুর্বলভাবে কাশতে শুরু করল ছেলেটা, লোনা পানি বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে বেশ অনেকখানি উপরে উঠে এল আলতাফ, শুইয়ে দিল বালির উপর। চোখ মেলল ছেলেটা, হতবুদ্ধি দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আলতাফের দিকে।

'এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে। একটু বিশ্রাম কর, ডিঙিটা নিয়ে আসছি আমি। দেরি করলে বহুদূরে চলে যাবে।'

ভেজা জুতো জোড়া খুলে রেখে পানিতে নেমে গেল আলতাফ আবার। বেশ কিছুটা দূরে আরেকটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইয়ের গায়ে গা ঘষছে, ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে ডিঙিটা। ডিঙিতে উঠে এদিকে পিছন ফিরে দাঁড় বাইতে শুরু করল আলতাফ। হঠাৎ থেমে গেছে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। পুব সমুদ্র থেকে ধীরে ধীরে উঠছে লাল সূর্য। বড় সুন্দর লাগছে ওর কাছে।

ডিঙিটাকে বেশ কিছুদূর বালির উপর টেনে তুলে জুতো জোড়া আবার পায়ে দিয়ে নিল আলতাফ। ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের ঝোপঝাড়ের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'কি হে, কেমন লাগছে এখন?' হাঁক ছাড়ল আলতাফ! খুশি মনে পা বাড়াল সামনে। ভাল একটা ছুতো পাওয়া গেছে। বিনা অনুমতিতে কেন ঢুকেছ বলতে পারবে

BanglaBook.org

না ব্যাটা আর। দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম বললেই সাত খুন মাফ।

আলতাফের ডাকের কোন জবাব দিল না ছেলেটা। স্থির হয়ে চেয়ে রয়েছে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের ওপাশে দেখা যাচ্ছে বিশাল প্রাচীরটা, বাঁকা হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রে। প্রাচীন।

ছেলেটার কাঁধের উপর একটা হাত রেখেই চমকে সরিয়ে নিল আলতাফ হাতটা। বালির দিকে চাইল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর পায়ের ছাপ। যেখানটায় খানিক আগে শুইয়ে দিয়েছিল ও, সেখান থেকে উঠে এসে এই পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও, ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে জঙ্গলের দিকে, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক, চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস।

আরেক জোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেল আলতাফ বালির উপর। হাল্কা পায়ের ছাপ। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এই দিকেই এসেছিল, ফিরে গেছে আবার। খালি পায়ের ছাপ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মেয়েমানুষের পায়ের।

মুহূর্তে বুঝে ফেলল আলতাফ। অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল ওর। ফুটোয় চোখ রেখে মা ও সন্তানের অকল্পনীয় নিখুঁত প্রতিমূর্তি দেখেই বুঝে নেয়া উচিত ছিল ওর সব।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী আগা থেকে গোড়া সব পড়া আছে ওর। শুধু পড়া নয়, প্রায় মুখস্থ আছে। পায়ের ছাপগুলোর দিকে চেয়েই চট করে মনে পড়ে গেল ভয়ঙ্কর গর্গনদের কথা।

গর্গনরা ছিল তিন বোন—মেডিউসা, ইউরিয়েল আর স্থেনো। ভয়ঙ্কর ছিল তাদের চেহারা। চুলের পরিবর্তে মাথা ভর্তি ছিল ওদের অসংখ্য লকলকে সাপ। এতই বীভৎস যে, ওদের কারও দিকে চাইলেই মুহূর্তে পাথর হয়ে জমে যেত জ্যান্ত মানুষ।

দাঁড়িয়ে রয়েছে স্তম্ভিত আলতাফ। প্রথম সূর্যের মোলায়েম রোদ পড়ছে ওর গায়ে। তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকছে সী-গাল। সেই সাথে কানে আসছে ঈজিয়ান সাগরের অবিরাম কলোচ্ছ্বাস। বুঝতে পেরেছে আলতাফ, পুরাকালের কারা তৈরি করেছিল এই বিশাল প্রাচীর, কেন সমুদ্রের মধ্যে নেমে গেছে এর দুই প্রান্ত, কাদের আটকে রাখবার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল এটা।

গর্ডন নামের কোন ইংরেজ পরিবার নয়, আরও অনেক, অনেক প্রাচীন এক পরিবার—গর্গন। মেডিউসাকে হত্যা করেছিল পারসিউস, কিন্তু ওর বাকি দুই বোন ইউরিয়েল আর স্থেনো মারা যায়নি, ওরা অমর।

অমর। সর্বনাশ! এ-ও কি সম্ভব? একটা অলীক পৌরাণিক কাহিনী···অথচ···

শির শির করে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল আলতাফের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে ওর অভিজ্ঞ শিল্পী-চোখ সামনের মূর্তিটার দিকে। নিখুঁত। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, ঘাড়টা সামান্য বাঁকা, চেয়ে রয়েছে জঙ্গলের দিকে, চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময়ের আভাস। খাড়া নাক, সুন্দর কপাল, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। দুই গাছি চুল এসে পড়েছে কপালে গোল হয়ে। সনাতন আদি ও অকৃত্রিম গ্রীক চেহারা। উন্মুক্ত কাঁধের উপর বিন্দু বিন্দু জমে আছে লোনা পানি। ছেঁড়া শার্ট থেকে এখনও পানি ঝরছে বালির উপর। মৃদু বাতাসে কাঁপছে শার্ট, বাড়ি খাচ্ছে পাথরের বুকে।

মূর্তিটা ত্রুটিশূন্য নয়। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত একটা কাটা দাগ, সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে উপরের ঠোঁট, দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঠোঁট-কাটা প্যান।

BanglaBook.org

পিছনে মৃদু একটা খসখস শব্দ শুনতে পেল আলতাফ। মনে হল আলতো পা ফেলে এগিয়ে আসছে কেউ। অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ এল নাকে। কেমন যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও এখন—মনে হচ্ছে অসংখ্য সাপ ফুঁসছে একসাথে।

উচিত হচ্ছে না, বুঝতে পারছে আলতাফ, তবু কৌতূহল দমন করতে না পেরে ঘুরল সে ধীরে ধীরে।

এবং চাইল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

যন্ত্রণা

রিভলভারটা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ড্রয়ার বন্ধ করে দিল লোকটা।

না, এইভাবে নয়। এভাবে যন্ত্রণা হবে না রুবিনার। বিনা কষ্টে পার পেয়ে যাবে মেয়েলোকটা, টেরও পাবে না কখন মারা গেছে। এমন কিছু করতে হবে, যাতে যন্ত্রণাটা অনেকক্ষণ···অনেকদিন স্থায়ী হয়। এমন কিছু, যেটা কেবল শারীরিক হলে চলবে না, মানসিকও হতে হবে। এমন কিছু, যেটা কুরে কুরে খাবে ওকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—কারও প্রেম, কারও আশ্বাস, কারও সান্ত্বনা কোন কাজে আসবে না, বুকের ভিতর খচ খচ বিঁধবে ছুরি দিনরাত, শয়নে-স্বপনে জাগরণে। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে···

যেই সে ভাবল 'কিভাবে?' অমনি পেয়ে গেল উত্তরটা। ঝিক করে বিদ্যুৎ চমকের মত চকিতে খেলে গেল গোটা প্ল্যানটা ওর মাথার মধ্যে। আশ্চর্য! আগাগোড়া সমস্তটা পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল এক নিমেষে। যেন জাদুমন্ত্র বলে। নাকি অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল সবকিছু ওর অবচেতন মনে? সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এল আজ? অনেক আগে থেকেই কি···

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যত্নের সঙ্গে কাফলিঙ্ক লাগাচ্ছে সে শার্টের হাতায়। বাচ্চাদের হুল্লোড়ের শব্দ কানে যেতেই চট করে জানালা দিয়ে চোখ গেল পার্কের দিকে। খেলছে একদল শিশু। ফুলের মত। রোজ বিকেলে আসে। গুলশানের বড়লোকদের অনেকগুলো সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে। লুসিও কি ওদের সাথে···না, আজ আর যাবে না লুসি। আজ ওর জন্মদিন। পার্টি। সন্ধে থেকেই আসতে শুরু করবে খুদে বন্ধুরা। এখন নিশ্চয়ই সাজছে ও মায়ের ঘরে।

কালো বো-টাইটা এঁটে জানালার ধারে আর্মচেয়ারে গিয়ে বসল লোকটা। চেয়ে রইল পাতাঝরা বিদঘুটে কাঁটাভর্তি শিমুল গাছটার দিকে। পার্কের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—বিষণ্নতার প্রতিমূর্তি। নিচতলা থেকে ভেসে আসা নানারকম সুস্বাদু

BanglaBook.org

খাবারের গন্ধে আবার মনে পড়ল ওর—লুসির জন্মদিন। গতকাল থেকে তৈরি হচ্ছে এসব খাবার। এখন বোধহয় টেবিল সাজাচ্ছে ওর মা।

আজ সারা দিন নীরবে কাঁদছে লোকটা। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। মুখ বা চোখ দেখে বুঝবে না কেউ। কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। অন্তরের অন্তস্তলে, অনেক গভীরে কোথায় যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে কে যেন। অবিশ্রাম। থামছে না। বছরের এই সময়টায় হয় ওর এরকম। কেমন যেন পাগল পাগল লাগে। গত ছয় বছর ধরে হচ্ছে। বছরের এই সময়টায়···না, এই দিনটায়, হ্যাঁ, এই দিনটায় হয় ওর এরকম। লুসির জন্মদিনে। ভিতরের বোবা মনটা কাঁদে ডুকরে ডুকরে।

অসংখ্য বেলুন ঝুলিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছে রুবিনা নিচের হলঘরটা। প্রকাণ্ড কেকটা বসিয়েছে টেবিলের ঠিক মাঝখানে। কেকের চারপাশে লাল-নীল সবুজ ছয়টা ছোট্ট মোমবাতি। মস্ত টেবিল জুড়ে ছোট বড় নানান আকারের পাত্রে অজস্র খাবার—যারা আসবে তারা একনাগাড়ে তিনদিন খেলেও ফুরোতে পারবে না। হরেক জাতের বিস্কিট, ডালমুট, পটেটো-চিপস, কলা-কমলা-নাশপাতি-আঙুর, সামুচা, ফ্রায়েড প্রন, চটপটি, লুচি, আলুর দম, সিঙারা, নিমকি, রসগোল্লা, সন্দেশ, চমচম, প্রাণহরা, কালোজাম, লালমোহন—খাও যার যত খুশি। খাও, ছড়াও, প্লেট ভাঙো—কেউ কিছু বলবে না। বলবে, থাক থাক, কি হয়েছে তাতে। এছাড়া বাড়ি ফেরার সময় শুধু অনেকগুলো করে বেলুনই নয়, প্রত্যেকে পাবে কলকাতা থেকে আনানো মুঠো মুঠো ক্যাডবেরি চকোলেট, ক্যাণ্ডি। মহা ফুর্তির দিন আজ লুসির। ওর মায়েরও। শুধু ফুর্তি নয়, আজ রুবিনার প্রতিশোধেরও দিন। আজই দিতে পেরেছিল সে চরম আঘাত।

পিছনে খস খস শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল লোকটা। দরজার সামনে নতুন জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে লুসি। ফুটফুটে চাঁদের মত। ভিতরে ঢোকা ওর নিষেধ।

'আব্বা, কেমন হয়েছে নতুন জামা?'

'সুন্দর।'

'খুব সুন্দর?'

'হ্যাঁ।'

'ছয়টা বাজতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কখন বাজবে?'

'বাজবে। সময় হলেই বাজবে,' হাসল লোকটা। 'ভেতরে আসবে?'

'না। আম্মা মারবে।'

অস্থির পায়ে নেমে চলে গেল লুসি নিচে। বড় একটা শ্বাস ফেলল লোকটা। লুসির কি দোষ? নিষ্পাপ শিশু—তুলতুলে, নিটোল, নরম, সুন্দর।

আসলে দোষটা কার তাহলে? ওর নিজের? মিলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিল, ম্যানেজার বানিয়ে দিয়ে সবার আপত্তি উপেক্ষা করে, মেয়ের মতামত পায়ে দলে রুবিনার সাথে ওর বিয়ে দিয়েছিলেন মালিক আলিম চৌধুরী। স্বস্তি পেতে চেয়েছিলেন অপুত্রক আলিম চৌধুরী। কিন্তু বছর না ঘুরতেই নিজ চোখে পারিবারিক অশান্তি দেখার চেয়ে মরে বেঁচেছেন। যাবার আগে বিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ছোট মেয়ের। এবার আর ভুল করেননি। ছেলের যোগ্যতা, বংশ, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা সব দেখে মেয়ের মত নিয়ে দিয়েছেন বিয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে বড় মেয়ের বিয়ের বেলায়।

তখনই কি আপত্তি করা উচিত ছিল ওর? রুবিনা যেমন আপত্তি জানিয়েছিল—ও তো চাকর, চাকরের সাথে আমার বিয়ে দিয়ো না আব্বা—তেমনি? ম্যানেজারীর লোভ, ক্ষমতার লোভ, একদিন এই মিলের মালিক হবার লোভ, সুন্দরী রুবিনার স্বামী হবার

BanglaBook.org

লোভ—সব ত্যাগ করা উচিত ছিল? সেটা মফঃস্বল থেকে আসা মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সাদামাঠা গ্র্যাজুয়েটের কাছে আশা করা যায়? দক্ষ ম্যানেজার হিসেবে মিলের পাঁচ বছরের ভবিষ্যৎ দেখতে পেত সে, কিন্তু বিবাহিত জীবনের পাঁচটা দিনও দেখতে পায়নি।

না, প্রথম রাতে বিড়াল মারতে পারেনি সে। ঠাণ্ডা, নির্বিবাদী মানুষ সে; শান্ত, ভদ্র, চাপা। সাতটা বছর দোজখের আগুনে জ্বলেছে, কিন্তু ভদ্রতা বজায় রেখেছে ঠিকই। আড়ষ্ট ভদ্রতা। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে দম আটকে আসছে, মনে হয়েছে ভেঙে চুরমার করে ফেলে সব—কিন্তু ভদ্রতার শক্ত খোলসটা ভাঙতে পারেনি কিছুতেই। আশ্চর্য এক ফাটকে আটকা পড়েছে সে, বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করছে বছরের পর বছর। ভদ্রভাবে। পাছে বংশ পরিচয় নিয়ে কথা ওঠে আবার, গ্রাম্যতা নিয়ে কথা ওঠে, টিটকারির পাত্র হয়ে উঠতে হয়।

পূর্ব-প্রেমিকের সাথে মেলামেশা বজায় রেখেছে রুবিনা। এ পরিবারের প্রত্যেকটি পার্টিতেই আসে সেই লোক—ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কবির। রুবিনা ডাকে কবি বলে। যেমন ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়, তেমনি চোস্ত ইংরেজি বুলি। তেমন স্মার্ট। চোখে-মুখে খৈ ফুটছে সর্বক্ষণ। কবিরের পাশে নিজেকে চাষা মনে হয়েছে ওর। রুবিনার সাথে ওর অবাধ মেলামেশা পছন্দ করতে পারেনি সে, কিন্তু আপত্তি তো দূরে থাক একটি কথাও বলতে পারেনি কোনদিন। জেনে এসেছে, এদের সমাজে এটা দোষনীয় কিছু নয়। ফ্রি মিকসিঙে বাধা দিয়ে গেঁয়ো চাষা বনতে চায়নি সে। প্রমাণ করতে চায়নি যে ওর মনটা ছোট, নীচু। বরং খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেছে। হোঁচট খেয়েছে পদে পদে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়েছে তীক্ষ্ণ টিটকারির তীর, চলায় বলায় সবকিছুতেই সম্মুখীন হতে হয়েছে তীব্র সমালোচনার। তবু এদের মূল্যবোধ, এদের আভিজাত্যের সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে সে মনেপ্রাণে। চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু হায়রে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কই, সাত বছরেও তো গ্রহণ করতে পারল না ওরা ওকে নিজেদের একজন বলে। এসবকে ওর মফঃস্বলী মনটাই বা সহজভাবে মেনে নিতে পারল কই? রাজধানীর আধুনিকতম 'পশ্' জীবনযাত্রা থেকে এতই পিছিয়ে রয়েছে দেশের আর সব অঞ্চল? নাকি গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে বলেই এমন উল্টেপাল্টে গেল ওর জীবনটা?

সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছে সে। তার সাথে মিলে সমস্যাটা বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করছে। গড়গড় করে বলে গেছে সে সব ঘটনা, সব কথা। ছোট শালীর ছড়াটা বলতে গিয়ে চোখ দিয়ে পানি এসে গেছে ওর—তবু বলেছে। বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে প্রতিটা শব্দ, মুখস্থ হয়ে গেছে একবার শুনেইঃ

পহেলা কুত্তা জো কুত্তা পালে,
দুসরা কুত্তা পর-ঘরওয়ালে।
তিসরা কুত্তা ব্যাহেন ঘ্যার ভাই,
চৌথা কুত্তা ঘর-জামাই ॥

না, ওকে না হলে চলবে না। লাটে উঠবে মিল। ছোটশালীর জামাই নিজের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। মিল দেখবার আর কেউ নেই। দিনরাত পরিশ্রম করে প্রাণ ওর বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়, কিন্তু এক ফোঁটা কৃতজ্ঞতাবোধ তো দূরের কথা, দিনের পর দিন বাড়ছে রুবিনার বিরক্তি। ও যেন নোংরা-আবর্জনা, দূর করতে পারলে বাঁচত সে। শ্বশুরের মিল দেখাশোনা করে উপার্জন করে, তাই একজন কর্মচারী সে ওদের মিলের। চাকর।

BanglaBook.org

না, আলাপ হয় না। কথা বলে না রুবিনা। লোকের সামনে নিতান্ত বাধ্য হলে বলে এক আধটা কথা, নচেত নয়। কোন গল্প হয়নি ওদের মধ্যে গত সাত বছরে। আড়ষ্ট, নিষ্প্রাণ একটা সম্পর্ক।

না, নিজের চোখে দেখেনি সে কিছু। কিন্তু বাচ্চাটা হয়েছে ঠিক কবিরের মত দেখতে। প্রথম জন্মদিনে লুসিকে কোলে নিয়েছিল কবির। অবাক হয়ে বলেছিল ও, 'বাহ! সুন্দর মানিয়েছে! হুবহু এক চেহারা। মনে হচ্ছে আপনারই মেয়ে!' বিচ্ছিরি এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল মুহূর্তে। সেই রাতেই ওর ঘরে এসেছিল রুবিনা। বলেছিল, 'একটা কথা খেয়াল রেখ—লুসি তোমারটা খায় না, ওর নানারটা খায়।'

না, কোনদিন ওর মন পায়নি সে বা তার আত্মীয়-স্বজন। একটি দিনের তরেও না। চাষা-ভুষোদের গুলশানের বাড়িতে ঢোকা নিষেধ। রুবিনার কথায়, চালচলনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায়নি আজ পর্যন্ত। ঘৃণা, আর দুর্ব্যবহার, তাচ্ছিল্য। চাহনিতে পর্যন্ত বিষ। ছুরি ঢুকে যায় কলজের মধ্যে। সময়? সময় কাটে ওর বাচ্চা নিয়ে। সারাদিন লুসিকে নিয়ে পাগল হয়ে আছে সে।

সব শুনে সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছিল, 'আপনারা দু'জনেই বোতলে পুরে রেখেছেন আপনাদের ইমোশন। বি ফ্রি। বৌ-বাচ্চা নিয়ে পিকনিকে যান, আউটিঙে যান, সিনেমায় যান, পার্টি দিন, হৈ-চৈ করুন।'

চেষ্টা করে দেখেছে লোকটা। কোন লাভ হয়নি তাতে।

বলেছিল, 'সেকসুয়াল স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের মূল কথা। তাকে যদি স্যাটিসফাই করতে পারেন তাহলে দূর হয়ে যাবে সব সমস্যা।'

চেষ্টা করে দেখেছে লোকটা। লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল ওকে রুবিনা খাট থেকে।

বলেছিল, 'বাচ্চাটাকে ভালবাসার চেষ্টা করে দেখুন। লুসিকে আদর করলে হয়ত পেতে পারেন স্ত্রীর মন।'

চেষ্টা করে দেখেছে লোকটা। ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে রুবিনা। সন্দেহের চোখে দেখেছে ব্যাপারটাকে। তবু হাল ছাড়েনি সে—গত বছর জন্মদিনে নানান রকম মজার খেলা দেখিয়ে মুগ্ধ করেছিল সে সব বাচ্চাদের। এবারও আশা করবে ওরা সেই আনন্দ। আশা করবে এবারও···

আর সেই সুযোগটাই নেবে ও।

কলিংবেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিচে রুবিনার পায়ের শব্দ এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। খুব সম্ভব সেলিনা এল তিন বাচ্চা নিয়ে। আরও গাড়ির আওয়াজ গাড়ি-বারান্দায়। দেখতে দেখতে হাসি, হুল্লোড়, চেঁচামেচিতে সরগরম হয়ে উঠল নিচের হলঘর। উঠে পড়ল লোকটা চেয়ার ছেড়ে।

গাঢ় ছাই রঙের কোটটা চাপাল সে গায়ে। ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়।

রঙচঙে কাগজে মোড়া ছোট বড় প্যাকেট নিচ্ছে রুবিনা এর-ওর হাত থেকে। উপহারের স্তূপ হয়ে গেছে একটা খালি টেবিলের ওপর, তার ওপর চাপাচ্ছে আরও। হাসছে, কুশল জিজ্ঞেস করছে, কচি কচি বাচ্চাদের চিবুক নেড়ে দিচ্ছে—ব্যস্ত। একপাশে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে চারদিকে চাইছে লুসি। সব আনন্দ শুষে নেয়ার চেষ্টা করছে যেন সে, কোন মজা যেন বাদ না পড়ে।

আশ্চর্য এক করুণার বোধ স্পর্শ করল লোকটার অন্তর। বাচ্চাটাকে ভালই লাগে ওর। বাপের স্নেহ পেল না বেচারি কোনদিন—পেল শুধু হৃদয়হীন এক মায়ের একতরফা আদরের নিষ্পেষণ। মনটা খারাপ হয়ে যায় যখন বাবা ডেকে জোর করে আদর আদায়

BanglaBook.org

করতে চায়, আব্দার ধরে, তখন। কী বোঝে অতটুকু মাসুম বাচ্চা? কোন দোষ নেই লুসির, অথচ···

কেমন একটু দ্বিধা এসে গেল লোকটার মধ্যে। কাঁদছে বোবা মনটা। এসবের মানে কি? কি অর্থ? আসলে গোলমালটা কোথায়? বেঁচে থাকার একঘেয়েমি? শুধুই রুবিনার অবহেলা, অত্যাচার, দুর্ব্যবহার? শুধুই লুসির জন্ম? নাকি ওর ভেতরেও রয়েছে গোলমাল? তা নইলে হঠাৎ একদিন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সুটকেস হাতে বেরিয়ে পড়ল না কেন সে? কেউ আটকাত ওকে? চলে গেলেই কি চুকে যেত না সব? কেন পারেনি? কেন বছরের পর বছর···

উত্তর পেয়ে গেল সে সাথে সাথেই। অসম্ভব। শোধ না তুলে কিছুতেই যেতে পারে না সে। ও নিজে যতটা আঘাত পেয়েছে, রুবিনাকে ঠিক ততটা যন্ত্রণা দিতে না পারলে শান্তি নেই ওর। ও যেমন কাঁদছে, ঠিক এমনি করে ওকে কাঁদাতে না পারলে হেরে যাবে সে। ছেড়ে চলে গেলে বা তালাক দিলে মোটেই কষ্ট হবে না রুবিনার, বরং খুশি হবে, বেঁচে যাবে। রুবিনা যাতে খুশি না হতে পারে, বেঁচে না যেতে পারে সেজন্যে দরকার হলে সারাজীবন থাকবে সে ওর স্বামী হয়ে। যেমন করে হোক প্রতিশোধ নিতেই হবে, আঘাত দিতে হবে ওকে, তীব্র আঘাত। লুসিকে যদি কোন আইনসম্মত উপায়ে ছিনিয়ে নেয়া যেত তাহলে ঠিক জায়গা মত গিয়ে লাগত চোটটা। কেবলমাত্র তাহলেই। সাত-সাতটা বছরের আক্রোশ আর জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হত তাহলে। হ্যাঁ, ছিনিয়ে নিতে হবে লুসিকে।

ওকে ছাড়াই কেক কাটার অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে দেখে দ্রুতপায়ে নেমে এল লোকটা নিচে। মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। সবার উদ্দেশ্যে বলল, 'হেল্লো এভরিবডি! কি খবর?'

রুবিনা চাইল না এদিকে।

'এই যে, আসুন, ম্যানেজার সাহেব!' বলল সেলিনার স্বামী, ছোট ভায়রা। 'আপনিও দেখছি মেহমান হয়ে গেছেন আজ, কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি দেখে নামছেন। তা প্রেজেন্টেশন কোথায়?'

সত্যিই, লুসির জন্মদিনে কোন উপহার দেয়নি সে। কেন জানি দিতে পারে না।

ছোট ভায়রার টিটকারির খোঁচাটা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিল বাচ্চারা। লোকটাকে দেখেই হৈ-হৈ করে উঠল খুশিতে—আজও জমবে খেলা সেই আশায়।

সাড়ে সাতটার মধ্যেই মোমবাতি নিভানো, কেক কাটা, খাওয়া-দাওয়া, বেলুন ফুটানো শেষ হয়ে গেল। রুবিনার হাত থেকে পার্টিটা আলগোছে কেড়ে নিল লোকটা সাবলীল ভঙ্গিতে। জমিয়ে তুলল সবাইকে গল্প-গুজবে, একাই ম্যানেজ করল এক কুড়ি বাচ্চা আর তাদের সাত জোড়া বাপ-মাকে। হাসিমুখে শ্যাম্পেন তুলে দিল কবিরের হাতে। ম্যাজিক দেখাল। কানামাছি, কুমির-কুমির, চোর-পুলিস খেলায় ছড়া কাটল।

এলাডিং বেলাডিং তেলাডিং চোর
মাইফোর ডিফোর ফরটি ফোর
এক লাঠি চন্দন কাঠি
চন্দন বলে কা কা
ইচিক মিচিক চিচিক চা ॥

তারপর হল মিউজিক্যাল চেয়ার। কচি কচি কণ্ঠের অকুণ্ঠ হাসি, চিৎকার আর হুল্লোড়ের শব্দে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে মনমরা বাড়িটা। কয়েকটা বাচ্চা আব্দার ধরল, 'এবার সেই ডাইনীর খেলাটা। খালু, সেই যে সেবার···নিচের ঘরে···'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে,' বলল লোকটা। 'সব বাতি নিভিয়ে দিতে হবে তাহলে।'

লাইট অফ করে দেয়া হল। দুটো মোমের আলো জ্বলছে কেবল। 'চুপ! সবাই এস আমার সাথে,' পা টিপে তলকুঠুরীর সিঁড়ির দিকে এগোল সে। কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে পিছু নিল বাচ্চারা, তারার মত ঝিকমিক করছে ওদের কৌতূহলী চোখ।

বড়রাও মজা পাচ্ছে এই আমোদে। পঞ্চমুখে প্রশংসা করছে মায়েরা, রুবিনার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত বোধ করছে। হাসিখুশি মানুষ কে না পছন্দ করে? বড়লোকদের জীবনে এই একটিই তো অভাব।

'সাবধান! ডাইনীর কবরে নামছি আমরা এখন! ওরে বাবা, ভয়ানক ডাইনী!'

খুশিতে বুকের ভেতর কাঁপন ধরে গেছে বাচ্চাদের। আতঙ্কে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করল লোকটা। বলল, 'ডাইনীটা জেগে থাকলেই সর্বনাশ! সাবধানে, পা টিপে নেমে যাও সবাই! একটু আওয়াজ পেলেই জেগে উঠে ডাইনী বলবেঃ হাঁউঁ মাঁউঁ খাঁউঁ, মানুষের গন্ধ পাঁউঁ। চেয়ার সাজানো আছে, বসে পড় সবাই চুপ করে।'

পুলকে শিহরিত বাচ্চারা এগোল সবাই পা টিপে। একটা তক্তা দিয়ে গর্তমুখটা ঢাকা। একজনের ঢোকার মত সামান্য একটু ফাঁক রয়েছে কেবল। একে একে নেমে গেল ওরা নিচের অন্ধকারে। গোল করে চেয়ার সাজানো, যে যেটা খালি পাচ্ছে বসে পড়ছে তাতে—ভয়-ভয় খুশিতে কথা বলছে চাপা গলায়। সবাই নেমে গেছে লুসি ছাড়া। চকচকে চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে গর্তের কাছে, আনন্দের চাপা উত্তেজনায় অন্যরকম হয়ে গেছে বাচ্চাটা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা মজা পেতে চায় ও, সব দেখতে চায়।

এইবার বড়রা! প্রশ্রয়ের হাসি ঠোঁটে নিয়ে নেমে গেল সবাই নিচে। জোড়ায় জোড়ায়। রুবিনাকে নামতে সাহায্য করবার জন্যে হাত বাড়াল লোকটা, কিন্তু স্যাঁৎ করে সরে, দ্রুতপায়ে নেমে গেল সে নিচে, সাহায্য ছাড়াই।

একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে উপরটা। কেউ নেই। মোমের ম্লান আলোয় খাঁ-খাঁ করছে শূন্য হলঘর।

লুসি দাঁড়িয়ে আছে ফোকরের পাশে।

'চলো এবার,' বলে লুসির একটা হাত ধরল লোকটা। 'না, ওদিকে না—এইদিকে।'

সবাই বসে গেছে। কিচিরমিচির করছে বাচ্চারা। রুবিনা বসেছে একেবারে ঐ পাশে। একটা গামলা মাথায় নিয়ে নেমে এলো লোকটা। রুবিনাকে দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। নিকষ কালো অন্ধকার। সিঁড়ির গোড়ায় নামিয়ে রাখল বড়সড় গামলাটা। টেনে নিল কাছে।

'এইবার!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'সব চুপ! ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে ডাইনীর!'

সবাই চুপ।

সিঁড়ির পাশে গোটা কয়েক স্টীলের ট্রে রাখা ছিল, ঝনঝন আওয়াজ পাওয়া গেল সেখানে।

'এই রে···সেরেছে! জেগে গেছে বুড়িটা। খবরদার! সামাল, সামাল! হুঁক্-হাঁক, হুঁক-হাঁক, হুঁক্-হাঁক্! ধুড়ুম-ধাড়ুম, ধাপুড়-ধুপ! আ···হ্! হাঃ হাঃ হাঃ হা! খতম! মারা পড়েছে ডাইনী বুড়ি!'

'ইইইইইইইইইইইইই!' হাঁক ছাড়ল বাচ্চারা।

'মারা পড়েছে ডাইনী বুড়ি। এই যে, এই ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে ওকে।'

কাছের একটা বাচ্চার হাতে ধরিয়ে দিল সে ছুরিটা। হাতে হাতে রওনা হয়ে গেল

BanglaBook.org

সেটা, এক হাত থেকে আরেক হাতে। পুরো চক্কোর ঘুরে ফিরে আসবে আবার।

'মারা পড়েছে ডাইনী বুড়ি। এই ধর তার মুণ্ডু!'

পাশের ছেলেটার হাতে গোল মত কিছু ধরিয়ে দিল লোকটা।

অন্ধকারে ওপাশ থেকে পুলকিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল একটা বাচ্চা। 'আমি জানি! সব জানি আমি! মার্বেল দিয়ে বলবেঃ এই দ্যাখ ডাইনীর চোখ, ভুট্টার দানা দিয়ে বলবেঃ এই দ্যাখ ডাইনীর দাঁত, মাটি দিয়ে…'

'চুপ কর,' আরেকটা কণ্ঠস্বর।

কিন্তু চুপ করবার মুডে নেই বাচ্চাটা। বলেই চলল, 'মাটি দিয়ে মাথা বানিয়ে তাতে মুরগীর পালক লাগিয়ে বলবেঃ এই দ্যাখ ডাইনীর কল্লা! সব জানি আমি! গরুর হাড় দিয়ে বলবেঃ ডাইনীর হাত, পুডিং দিয়ে বলবে…'

'আহ্, চুপ কর!' চাপা গলায় ধমকে উঠল ওর বড় বোন। 'খেলাটা নষ্ট করবি না, গাধা।'

'কথা বলে না,' বলল লোকটা। 'সব চুপ! এই ধর ডাইনীর হাত।'

'ইইইইই!'

একে একে আসছে ডাইনীর বাম হাত, ডান পা, বাম পা, নাড়ীভুঁড়ি। কয়েকটা বাচ্চা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। একটা দুটো জিনিস ধরার পর আর ছুঁতে চাইছে না। চেয়ার ছেড়ে ঘরের মাঝখানে চলে গেছে কয়েকজন। ডাইনীর ভেজা ভেজা পিচ্ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছুঁয়ে গা রি রি করছে ওদের।

'আরে, ভয়ের কিছুই নেই,' বলল একটা ছেলে। 'ধর মিনি, মুরগীর নাড়ীভুঁড়ি এগুলো।'

হাতে হাতে ঘুরছে জিনিসগুলো। ধরেই কাল্পনিক ভয়ে চেঁচিয়ে উঠছে কেউ কেউ। হাসছে বেশির ভাগ।

'টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে ডাইনীটাকে,' বলল লোকটা। 'এরপর ধর ওর কলজেটা। এখনও আত্মাটা রয়েছে এর ভেতর—নড়ছে দেখ।'

ওপাশ থেকে রুবিনার কণ্ঠ শোনা গেল। 'লুসি, ভয় পেও না, এটা মিছেমিছি খেলা একটা।'

লুসি কোন কথা বলল না।

'লুসি?' আবার জিজ্ঞেস করল রুবিনা। 'ভয় পেয়েছ?'

কথা বলল না লুসি।

'ঠিকই আছে ও,' বলল লোকটা। 'ভয় পায়নি।'

এহাত থেকে ওহাতে যাচ্ছে ডাইনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো। ছুরিটা কেবল ফিরে এসেছে আর সব ঘুরছে এখনও হাতে হাতে। বিস্ময়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, চেঁচিয়ে উঠছে কেউ কেউ ভয়ে, আবার হাসছে। দিচ্ছে পাশের জনকে।

ছোট্ট ফোকর দিয়ে এক ঝলক দমকা হাওয়া এসে ঢুকল তল-কুঠরীতে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে নানান রকম উদ্ভট ভয়াবহ আওয়াজ করে সবাইকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে লোকটা।

'লুসি?' ওপাশের অন্ধকার থেকে হঠাৎ আবার ভেসে এল রুবিনার কণ্ঠস্বর।

সবাই কথা বলছে।

'লুসি?' ডাকল রুবিনা গলাটা আর এক পর্দা চড়িয়ে।

সবাই চুপ হয়ে গেল।

'লুসি, কথা বলছ না কেন? ভয় পেয়েছ?'

BanglaBook.org

কোন উত্তর দিল না লুসি।
লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। চুপ।
রুবিনা ডাকল, 'লুসি, তুমি এই ঘরে?'
কোন উত্তর নেই। স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘরটা।
'কোথায় লুসি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রুবিনা।
'এইখানেই তো ছিল,' বলল একটা ছেলে ভয়ে ভয়ে।
'হয়ত ওপরে থাকতে পারে,' বললো আরেকজন।
'লুসি!'
উত্তর নেই। সব চুপ।
গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রুবিনা, 'লুসি, লুসি!'
'লাইটটা জ্বেলে দাও,' ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কবিরের গলা।
হাত বদল হওয়া থেমে গেছে। ডাইনীর টুকরো অংশ যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে বসে রয়েছে সবাই। উৎকর্ণ।
'না!' ফুঁপিয়ে উঠল রুবিনা। অন্ধকারে একটা চেয়ার সরাবার শব্দ হল। 'না, না! দোহাই তোমাদের, বাতি জ্বেল না! খোদা! ইয়া আল্লা! মাবুদ! দোহাই লাগে, বাতি জ্বেল না। প্লীজ, প্লীজ, বাতি জ্বেল না! জ্বেল না!' শেষের দিকে উন্মাদিনীর মত চেঁচিয়ে উঠল রুবিনা। ওর কলজে কাঁপানো চিৎকারে হিম হয়ে গেল ঘরটা।
কেউ নড়ল না।
সবাই যেন সেঁটে গেছে চেয়ারের সঙ্গে! আর এক ঝলক দমকা হাওয়া এল কেক, বিস্কিট আর অন্যান্য খাবারের গন্ধ বয়ে নিয়ে। হাতে ধরা জিনিসগুলো থেকেও কেমন যেন একটা আঁশটে গন্ধ আসছে।
একটা ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি দেখে আসছি,' দৌড়ে ওপরে চলে গেল ছেলেটা। সারা বাড়ি খুঁজল লুসিকে, ডাকল, 'লুসি, লুসি লুসি,' তারপর ফিরে এল শুথ পায়ে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। অন্ধকারের উদ্দেশ্যে বলল, 'পেলাম না। কোথাও নেই।'
ঠিক এমনি সময় কোন্ গর্দভ যেন জ্বেলে দিল বাতিটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ইচ্ছা

এই ধরুন, প্রথম যেদিন দশ টাকার নোটটা তৈরি করি সেদিন ভয়ানকভাবে চমকে গিয়েছিলাম আমরা, দু'জনেই। হীরা আমার স্ত্রী, বসেছিল ছোট্ট তেপায়া টেবিলের ওপাশে। আমারই মত বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখ। হাঁ করে ওটার দিকে চেয়ে এক মিনিট বসে রইলাম আমরা। থ হয়ে গেছি একেবারে। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে সামনে ঝুঁকে এল ও, হাত বাড়াল ভয়ে ভয়ে, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল প্রথম, তারপর হাতে তুলে নিল নোটটা।

'হায় হায়! কোত্থেকে এল এটা! কি করে হল?'

জবাব দেয়ার মত কোন কথা যোগাল না আমার মুখে।

'একেবারে আসল নোটের মত!' বলল ও। চিন্তা করছে ভ্রূ কুঁচকে। নেড়েচেড়ে দেখল। 'দেখতে মনে হচ্ছে আসল, ছুঁয়ে মনে হচ্ছে আসল। আসলে চলবে কিনা ভাবছি,' আমার চোখের দিকে চাইল। 'তোমার কি মনে হয়?'

'আল্লাই মালুম,' হাত বাড়ালাম। 'দেখি?'

নোটটা নিয়ে দুই আঙুলে ঘষে দেখলাম, কড়কড় করছে। আলোর সামনে তুলে ধরলাম, একেবারে নিখুঁত। সরু, লম্বা দাগটা, বাঘের মাথায় জলছাপ, অসংখ্য সূক্ষ্ম কারুকাজ আর নকশা, ছবি—একেবারে পরিষ্কার। বঙ্গবন্ধুর থুতনির ভাঁজ, চমশার স্ক্রু, উল্টোপিঠে পাল তোলা নৌকো, কুঁড়ে ঘর, খড়ের গাদা, তাল গাছ, বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম—কোথাও একবিন্দু খুঁত নেই। কুচকুচে কালো কালিতে ছাপা রয়েছে নম্বর।

কোন ত্রুটি চোখে পড়ল না আমার।

আমার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব বুদ্ধি রাখে আমার স্ত্রী। বলল, 'যা দেখার দেখা হয়ে গেছে, এবার আসল দেখা দেখে এস। সামনের ঐ বেকারিতে গিয়ে পাঁউরুটি-মাখন আর কিছু বিস্কিট নিয়ে এস।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলাম হাসিমুখে। পাঁউরুটি-মাখন আর বিস্কিট ছাড়াও

BanglaBook.org

ছোট এক প্যাকেট চা আর একটিন কনডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক নিয়ে ফিরলাম। ভাঙতি বিশটা পয়সা অক্লেশে দিয়ে দিয়েছি বাচ্চা দুটো ন্যাংটো ফকিরকে।

সন্ধে হতে দেরি আছে। তিন ছেলেমেয়েকে ভাগিয়ে দিলাম রাস্তায় খেলা করবার জন্যে। সবচেয়ে ছোটটা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। তশতরিহীন কানাভাঙা দুটো কাপ দু'হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল হীরা। কাপ দুটো টেবিলের ওপর রেখে বসল ওপাশের নড়বড়ে চেয়ারটায়। বহুদিন পর আবার চা খাচ্ছি আমরা বাসায়। চিনি অবশ্য নেই, কিন্তু কুছ পরোয়া নেই, দুধের মধ্যে যেটুকু মিষ্টি আছে ওতেই হয়ে যাবে—চা তো খাচ্ছি।

মুখোমুখি চেয়ারে বসে আমার চোখের উপর চোখ রাখল হীরা। দেখলাম ওর অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটোর কোলে কালি পড়েছে। একদিন দু'দিন নয়, দীর্ঘ দশ বছর ধরে জমে ওঠা কালি। দশ-দশটা বছর অনটনের সংসারে ঘানি টানা, চার-চারটে বাচ্চার চাহিদা মেটানো, এই ক'টা টাকায় কি করে মাস চলবে তারজন্যে সর্বক্ষণ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা—সব মিলে শেষ করে দিয়েছে বেচারিকে। বলল, 'এবার?'

'এবার আরও কয়েকটা বানাতে হবে,' বললাম। 'বাজারে যাব। বহুদিন গোস্ত খাই না। তোমার জন্যে একটা ভার্ডিভিটনও আনতে হবে,' হাসলাম। 'গরমে ঘুম হয় না, ভাবছি, একটা টেবিল ফ্যানও কিনে আনব। দেখি, নোটটা দাও দেখি আবার।'

ওটাই ছিল আমাদের শেষ দশটাকার নোট। অথচ সেদিনটা ছিল মাসের ষোল তারিখ, বাকি চোদ্দটা দিন কিভাবে চলবে রাত জেগে তাই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবার সময় এসে গিয়েছিল, নোটটা টেবিলের ওপর ফেলে আলটিমেটাম দিয়েছিল হীরা—আমি পারব না, তুমি চালাও সংসার। যাই হোক, আবার বের করল ও নোটটা বছর পাঁচেক আগের কেনা সস্তা হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে, নড়বড়ে তেপায়া টেবিলের ওপর বিছালো ওটা, আঙুল দিয়ে চেপে সমান করল।

খানিকটা কাছে টেনে নিলাম আমি ওটাকে, তারপর দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলাম নোটের ওপর।

প্রায় সাথে সাথেই আকার নিতে শুরু করল ডুপ্লিকেট নোট। প্রথমে ফুটে উঠল মোটামুটি নক্সাটা, তারপর দেখা দিল রঙ, তারপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দাগগুলো পর্যন্ত ফুটে উঠল পরিষ্কার। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আরেকটা নোট।

হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা হীরা। পরীক্ষা করছে। ইতিমধ্যে আরও দশটা বানিয়ে ফেলেছি আমি। একটা করে তৈরি হচ্ছে আর পকেটে ভরছি। ঘুমন্ত বাচ্চাটা প্যাঁ করে উঠতেই হীরা ছুটল ওদিকে। পাঁচ মিনিটে ষাটটা বানিয়ে উঠে পড়লাম আমি। দুই ঢোকে চাটুকু শেষ করে, শার্টটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাজারের থলে হাতে।

ইলিশ মাছ, খাশির কলেজি, চাপের মাংস, সেই সাথে পাঁচ রকম ভাজি-ভর্তা-তরকারি দিয়ে তৃপ্তির সাথে খেয়ে উঠলাম আমরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। আজ আর মাপাজোখা নেই, খাও যার যত খুশি। পেট ঠেসে ভাত খাওয়ার পর আমার চার বছরের বাচ্চাটা যখন পুরো একটা ফজলি আম খেয়ে আরও একটা চাইল, চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল আমার। হীরা আপত্তি করতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, 'থাক, থাক। জীবনের প্রথম, খুব মজা লেগেছে নিশ্চয়ই।' বলতে যাচ্ছিলাম আর কোন ছেলেপিলেদের আম খেতে দেখে কত লোভ না জানি জন্মেছিল ওর মনে, কিন্তু বললাম না আমাকে আড়াল করে হীরাকে চট করে চোখ মুছে নিতে দেখে।

টেবিল ফ্যানটা কেমন সুন্দর মাথা ঘোরাচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশ, বাচ্চাদের কাছে রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার, কিন্তু বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারল না কেউ। একে ছোট,

BanglaBook.org

তার ওপর তৃপ্তির সাথে ভরপেট খাওয়ার পর ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ ভেঙে ঘুম এল ওদের। লাইন দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবক'টা।

দুটো ছাঁচি পান কিনে নিয়ে এলাম আমি মোড়ের দোকান থেকে। একটা হীরার মুখে গুঁজে দিয়ে নিজের মুখে পুরলাম অপরটা, বহুদিন পর ধরালাম একখানা ক্যাপস্টান সিগারেট। তুফানের মত হাওয়ায় তৃপ্তির শিহরণ লাগল আমার গায়ে।

চোখটা লেগে এসেছিল, হীরা ডাকল, 'ওগো, শুনছো?'

'উঁ?'

'কেউ কিছু সন্দেহ করেনি? মানে, নোটগুলো নিতে?'

'উঁহুঁ।'

পাশ ফিরতে যাচ্ছিলাম, গেঞ্জি খামচে ধরল হীরা। 'কিন্তু কাজটা তো বেআইনী। ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে তোমাকে। ছেলেপিলের কথাটা ভেবে দেখেছ? জালিয়াতির দায়ে ধরা পড়লে…'

'কোন্ কাজটা বেআইনী করলাম বুঝিয়ে দিতে পারবে?' উঠে বসলাম বিছানায়। সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলাম তেপায়া টেবিলটার ওপর থেকে।

'টাকা জাল করাটা…'

'জাল কোথায় দেখলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আসলের থেকে কোন তফাৎ আছে ওগুলোর? জাল মানে হচ্ছে আসলের অনুকরণ, নকল। কিন্তু এগুলোর মধ্যে নকল তো কিছুই নেই। প্যাথোলজিস্টের মাইক্রোস্কোপের নিচে ধরে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। একচুল এদিক ওদিক নেই। হুবহু এক। আমার বিশ্বাস প্রতিটা অণু-পরমাণু পর্যন্ত মিলে যাবে। একে নকল বললে তুমি কোন্ যুক্তিতে?'

কোন জবাব দিতে পারল না হীরা, ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'তোমার বংশের আর কারও মধ্যে ছিল এই ক্ষমতা?'

'নাহ্। বাপের দিকের কারও মধ্যে ছিল না, আমি শিওর। তবে মায়ের দিকটা শিওর হয়ে বলা যাচ্ছে না কিছুই। তোমাকে তো বলেছি, কামরূপ কামাক্ষায় জাদু শিখতে গিয়ে নানীর মাকে বিয়ে করে এনেছিল আমার বড় বাপ। বিয়ের পরই তার অবস্থা ফিরে যায়। নানীরা তিন বোন—সেই তিন জনের স্বামীদের অবস্থা চিন্তা করে দেখ। কি অবস্থা থেকে কী অবস্থায় উঠে গিয়েছিল। হয়ত ওদের মধ্যে এই ধরনের ছিল কিছু ক্ষমতা, জানি না।'

'তোমার এক খালা ভবিষ্যতের অনেক কিছু বলে দিতে পারত না?'

'হুঁ। উনিই বলে দিয়েছিলেন আমার দশ বছর বয়সে মারা যাবেন আমার মা।'

'তোমাদের অবস্থাও তো খুব ভাল ছিল বলে শুনেছি।'

'হ্যাঁ। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন। মা মারা যাওয়ার পরও কয়েক বছর বেশ ভাল ছিল, তারপর থেকে ডুবতে ডুবতে একেবারে অতলে।'

'তুমিই তো তোমার মায়ের একমাত্র ছেলে।'

'মা বলতেন, তুইই আমার ছেলে মেয়ে—সব। বোন নেই যে তার কাছে আপদে বিপদে হাত পাতবি। তোকেই আমার সব ক্ষমতা দিয়ে যেতে হবে দেখছি। মরার দিন আমাকে কোলে নিয়ে কপালে চুমো খেলেন, বললেন, যদি কোনদিন বিপদে পড়িস, আমার গুণ বর্তাবে তোর ওপর। তারপর আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে হার্টফেল করলেন—ভণ্ডুল হয়ে গেল আমার জন্মদিনটা।'

'তুমি নিজের মধ্যে এ ধরনের ক্ষমতা টের পাওনি আগে?'

'নাহ্। আজই প্রথম। শেষ দশ টাকার নোটটা দেখে বাজ ভেঙে পড়ল মাথার

BanglaBook.org

ওপর। তারপর কি ঘটল নিজের চোখেই তো দেখলে।'

'অবস্থাটা বাজ ভেঙে পড়ার মতই হয়েছিল। অসহ্য হয়ে উঠেছিল জীবনটা। আমি ভাবছিলাম আবার ফিরে যাব নার্সিঙে। তাতে যদি দুটো পয়সা আনতে পারি এই অভাব, অনটন আর হাকাকার—আধ-পেটা খাওয়া, ছেঁড়াজামা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, সর্বক্ষণের নাই-নাই, হা-হুতাশ—কিছুটা তো কমবে। সত্যিই আর পারছিলাম না।'

আমিও বুঝি সেটা। এর কাছে পাঁচ, ওর কাছে দশ, তার কাছে বিশ—কত টাকা আর ধার করা যায়? এই আক্কারার বাজারে তিনশো টাকা একটা বেতন হল? ঘুষ খাই না—মানে, খাওয়ার সুযোগ নেই। চারটে ছেলেমেয়ে, স্বামী-স্ত্রী। বাড়ি ভাড়া একশো টাকা, গত ছয়মাস থেকে তাগাদা করছে দেড়শো করে দেয়ার জন্যে। শান্তিবাগের ঘিঞ্জি এলাকায় টিনের চাল দেয়া একটা ঘর, বাথরুমের সমান একটা রান্নাঘর, তার অর্ধেক বাথরুম—দেড়শো করে না দিলে জিনিসপত্র টান দিয়ে বাইরে ফেলে দেবে বাড়িওয়ালী। রেশন কার্ডগুলোও বাতিল হয়ে গেছে ইন্সপেকশনের পাল্লায় পড়ে। রব উঠেছিল আগেই। কয়েকদিন ইন্সপেক্টরদের জন্যে অপেক্ষা করে করে বাচ্চাদের নিয়ে ঠিক যেদিন গেল হীরা শয্যাশায়ী মাকে দেখতে, আসবি তো আয় সেদিনই এসে হাজির ইন্সপেকশন টীম। ফলে আমারটা রইল কেবল, আর সব ক্যানসেল। একটা কার্ডের রেশনের জন্যে বিশাল লাইনের পিছনে দাঁড়াবার এবং বস্তিবাসীদের সাথে গুঁতোগুঁতি করবার মত মানসিক শক্তির অভাব ঘটায় ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছি আমি কার্ডটা। দেশে জমিজমা নেই যে সেখান থেকে চাল ডাল এনে উতরে নেব সংসারটা কোনমতে। বেশ কিছুদিন আগেই বুঝে নিয়েছি, ফুটো হয়ে গেছে আমার নৌকোয়, ডুবছি আমি সবাইকে নিয়ে। হপ্তায় হপ্তায় বাড়ছে সব জিনিসের দাম। শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম আমি 'কোনদিন জাগব না জেনে'। আর পারছিলাম না, এমনি সময়ে ক্ষমতাটা বর্তালো আমার ওপর।

সেই রাতটা জীবনে ভুলব না আমি কোনদিন। পরম সুখে ঘুমাচ্ছে বাচ্চারা। হীরার হাতে হাত রাখলাম। অকপটে দু'জন দু'জনের কাছে মেলে ধরলাম মন। ওকে বললাম আমি কত কি চাই। কত কি আশা, আকাঙ্ক্ষা, মনের গোপনতম ইচ্ছে, সব বলে ফেললাম গড়গড় করে, ও বলল ওরটা। এমন সব কথা বললাম সেদিন আমরা দু'জন যা কেউ কোনদিন বলে না, শুধু নিজে নিজে ভাবে, কল্পনা করে।

পরদিন সবার আগে ঘুম ভাঙল আমার। আস্তে ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিলাম হীরাকে। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম দু'জন। একের পর এক বানিয়ে চললাম আমি, গুণে গুণে একশো একশো করে সাজিয়ে হাজারের বাণ্ডিল বাঁধল হীরা। দশ হাজারের আগে থামলাম না আমি। তারপর নাস্তা খেয়ে সবাইকে রেডি করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—মন খুলে মার্কেটিং করব আজ।

রোদ সহ্য করতে না পেরে ফিরে এলাম আমরা দুটোর মধ্যেই। তখনও দু'হাজার রয়ে গেছে হাতে। তিন রিক্সা বোঝাই মাল নিয়ে ফিরলাম। জামা-কাপড়-শাড়ি, কাপ-তশতরি-প্লেট, ট্রাইসাইকেল-উড়োজাহাজ-খেলনা-গাড়ি-পুতুল, ইলেকট্রিক রেযার-কসমেটিকস-তেল-সাবান, জুতো-স্যাণ্ডেল-স্লীপার, আরও কত কি—দামের পরোয়া নেই, জিজ্ঞেস করবারও দরকার নেই, যা পছন্দ, যা খুশি, কেবল তুলে নেয়া। বাড়িওয়ালীর দুই চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল আমাদের তিন রিক্সা বোঝাই ছোটবড় হরেক আকৃতির প্যাকেট নিয়ে ফিরতে দেখে। স্থির করলাম ভাল একটা বাসায় উঠে যাব যত শিগগির সম্ভব। অপরিচিত কোথাও।

BanglaBook.org

বেলা চারটের দিকে মনে পড়ল অফিসের কথা। একটা স্কুটার ডেকে চলে গেলাম আকবরের রেস্তোরাঁয়। সেই কলেজ লাইফ থেকে এখানে আমার যাতায়াত। এখনও যাই, পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে আসে, পিছনের ঘরে চলে তাস, আড্ডা। ওখান থেকে ফোন করলাম অফিসে। পরিচয় দেয়ার পর আমার বসকে শেখাবার চেষ্টা করলাম কিভাবে ঠিকমত অফিস চালাতে হয়। প্রথমে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে গেল বদমেজাজী লোকটা, তারপর তোতলাতে শুরু করল। আমিও তো-তো-তো করে ভ্যাঙালাম ব্যাটাকে। নরম দেখে গোটা দুয়েক গালিও দিলাম। ওপাশ থেকে ঝটাং করে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দে বাঁচলাম। ছুট্টি!

যাই হোক, যে গল্প বলছিলাম—ঐভাবে শুরু হল ব্যাপারটা। একহপ্তার মধ্যে মৌচাক মার্কেট, স্টেডিয়াম, বায়তুল মোকাররম, নিউ মার্কেট, এলিফ্যান্ট রোডের দু'পাশের ঝকঝকে সব দোকান চষে ফেললাম আমরা। আসবাবের দিকে গেলাম না আমরা যুক্তি করে। ভাল বাসায় গিয়ে হবে ওসব, এখানে রাখবার জায়গা নেই। শুধু রান্নার চুলোটা বদলি করা হল—কালের অবক্ষয়ে বেচারির তিন ঠ্যাঙ খসে গিয়ে এক ঠ্যাঙে ঠেকেছিল বলে। আমি মন দিলাম ভাল এলাকায় একটা ভাড়া-বাড়ি খোঁজায়, যেখানে প্রতিবেশীর আর্থিক উন্নতিতে চোখ টাটাবে না কারও। দু'সপ্তাহ ঘোরাঘুরি করেও মনের মত বাড়ি পেলাম না। আমার পছন্দ হয় তো হীরার পছন্দ হয় না, ওর হয় তো আমার হয় না। বাচ্চাদের স্কুল থাকতে হবে কাছে-পিঠে, বাজারটাও দূরে হলে চলবে না, আবার গাড়িঘোড়ার আওয়াজ থেকে একটু আড়াল থাকতে পারলে ভাল, এতসব কিছু একসাথে পাওয়া মুশকিল। হাল ছেড়ে দেয়ার আগে হঠাৎ করে মনে পড়ল বাবলার কথা। ফোন করলাম আকবরের রেস্তোরাঁয়।

'আচ্ছা, আকবর মিয়া, কি এক বাড়ি-ভাড়া কোম্পানিতে কমিশনে কাজ করছিল না আমাদের বাবলা? ওকে পাওয়া যাবে কোথায় বলতে পারেন?'

'কোথায় পাওয়া যাইব আবার, এইত্ত আমার সামনে বইসা। এখন সেই সাথে ইনশিওরেন্সও করতাসে। আমারে বাঁচান ভাই-সাহেব, কিছু একটা কাজ দিয়া এরে যদি আমার ঘাড় থেইকা নামাইতে পারেন, হাজার শোকর গোজার করুম আল্লার কাছে।'

'ফোনটা দিন ওকে।'

ওকে ঐ দোকানেই আরও পনের মিনিট আকবর মিয়ার উপর ট্রাই করার নির্দেশ দিয়ে ছুটলাম বেবিট্যাক্সি নিয়ে। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তার এক মিনিট আগে পাঁচ মিনিটে আসছি বলে কাছেই কোথাও গেছে বাবলা। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলাম। দশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিলাম একটা ছোকরার হাতে এক প্যাকেট ক্যাপস্টান কিনে আনবার জন্যে। এদিক ওদিক খুঁজলাম পড়ার কিছু আছে কিনা। আজকের কাগজটা আসেনি এখনও, গত কালকের একটা ইত্তেফাক পড়ে আছে পাশের টেবিলে। নাড়াচাড়ায় প্রায় ভর্তা হয়ে আসা পেপারটাই হাতে তুলে নিলাম—এক সপ্তাহের আগের হলেও আপত্তি ছিল না আমার, কারণ কাগজ পড়বার অভ্যাস ছুটে গেছে বহুদিন হল, সব খবরই আমার কাছে আনকোরা নতুন। আকবর মিঞা মন দিয়ে হিসেব মেলাচ্ছে, আমি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চোখ বুলাচ্ছি হেডিংগুলোর ওপর। হঠাৎ চোখে পড়ল খবরটা। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়। সমস্ত মনোযোগ এসে স্থির হয়েছে ছোট্ট খবরটার উপর। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা বিশেষ বিজ্ঞপ্তিঃ

দশ টাকার জালনোট

জনসাধারণের সুবিধার জন্য জানান যাইতেছে যে একই ক্রমিক সংখ্যার একাধিক দশ

BanglaBook.org

টাকার নোট বাজারে চালু রহিয়াছে। নোটগুলি এতই দক্ষতার সহিত নকল করা হইয়াছে যে ক্রমিক সংখ্যা মিলাইয়া না দেখিলে জাল কিনা বুঝিবার আর কোন পথ নাই।

ক্রমিক সংখ্যাঃ ৬৮০৭০৯৭২

জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, যে এই নম্বরের দশ টাকার নোট কাহাকেও হস্তান্তর করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ নোটের মালিককে হয় পুলিসের হাতে সোপর্দ করিবেন, নতুবা তাহাকে আটক করিয়া ফোন নং ৪০৫৩৩২-এ জানাইবেন। অনুমান করা যাইতেছে, অত্যন্ত সংঘবদ্ধ কোন দল নিখুঁতভাবে নোট জাল করিয়া উহা বাজারে চালাইবার প্রয়াস পাইতেছে। জেনারেল স্টোরগুলিকে বিশেষভাবে সাবধান করা যাইতেছে, কারণ উপরোক্ত ক্রমিক সংখ্যার যে কয়টি নোট সনাক্ত করা গিয়াছে সেগুলি ঢাকার নিউমার্কেট ও বায়তুল মোকাররমের কয়েকটি জেনালের স্টোরে চালানো হইয়াছে।

ভাগ্যিস বসে ছিলাম, দাঁড়িয়ে থাকলে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যেতাম। ৬৮০৭০৯৭২ লেখা দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে ছোকরাটাকে আমার দিকে এগোতে দেখে কলজে শুকিয়ে গেল আমার। কী ব্যাপার! ফিরে আসছে কেন? সিগারেটওয়ালা চিনে ফেলেছে? সোজা এসে আমার সামনে ব্রেক কষল ছোকরা।

'ঐ হালার কাছে ভাঙতি নাইক্কা, স্যার।'

আকবর মিয়া হাঁক ছাড়ল, 'এদিক লোইয়া আয়, বাঙ্গায়া দিতাছি।'

কাঁপাহাতে প্রায় ছিনিয়ে নিলাম নোটটা ওর হাত থেকে। বললাম, 'আমার কাছেই আছে,' এ পকেট ও পকেট খুঁজতে গিয়ে একতোড়া পড়ে গেল মেঝেতে। ওটা তুলে প্যান্টের ডান পকেট থেকে এক টাকার তিন-চারটে নোট বের করে দিলাম ছোকরার হাতে। বুকের ভেতর ধুমধাম হাতুড়ি পিটছে। গরম ভাপ ছুটছে দুই কান দিয়ে। গেছিলাম আর একটু হলে! বাবলা এসে ঢুকল। আমার জন্যে বাড়ি খুঁজতে বলেই বেরিয়ে পড়লাম আমি রেস্তোরাঁ থেকে। কি ধরনের বাড়ি চাই তার বর্ণনা শুনে দু'চোখ কপালে উঠল বাবলার, হঠাৎ কি করে এত বড়লোক হয়ে গেলাম ঠাট্টার ছলে সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলল, রসিকতা করল, কিন্তু ওসব কোনকিছুতে কান না দিয়ে উঠে পড়লাম বেবিট্যাক্সিতে। সারাটা দিন একটি কথা বললাম না কারও সাথে, অনর্থক ভয় পাবে বলে কিছুই জানালাম না হীরাকে। অর্ধেক রাত পার করে দিলাম আকাশ-পাতাল চিন্তা করে।

প্রথম ভেবে দেখলাম কোন অন্যায় করছি কিনা। বেআইনী কিছু করতে চাই না, সে রকম কিছু করছি মনে করেও টাকা তৈরি করিনি আমি। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। এতদিন ভাল করে ভেবে দেখিনি, কিন্তু আজ আমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ ব্যাপারে। হাল্কাভাবে নিয়েছিলাম সবকিছু, মহাফুর্তিতে টাকা তৈরি করছিলাম আর খরচ করছিলাম দেদার। সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার, ভবিষ্যতে আর টাকা বানাব, না ছেড়ে দেব।

অনেক ভাবলাম। ভেবে দেখলাম, একেক মানুষ জন্ম নেয় একেক গুণ নিয়ে। কেউ দেখতে সুন্দর, কেউ আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, কেউ জন্মায় শিল্পী হয়ে, কেউ বা নেতা। আমি ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই হতে পারি না—আমার ক্ষমতার সীমা বেঁধে দিয়েছে প্রকৃতি বা খোদা, যে যাই বলুন। আমার মধ্যে যে ক্ষমতা আছে সেটাও যে-কেউ চাইলেই পাবে না। একজন এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার, একজন তুখোড় ব্যারিস্টার, একজন কালীনারায়ণ স্কলারশিপ পাওয়া ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট প্রতিভাবান প্রফেসার বা রিসার্চ স্কলার যদি তার বিশেষ গুণ ব্যবহার করে উপার্জন করতে পারে,

BanglaBook.org

খেয়ে পরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে, তাহলে আমিই বা পারব না কেন? নিশ্চয়ই পারা উচিত। তবে দেখতে হবে এর ফলে মানুষের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা।

আমি কি মানুষের বা দেশের কোন ক্ষতি করছি? ভাল করে ভেবে দেখলাম, সরকার টাকা ছাপছেন, ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষের হাতে পৌঁছুচ্ছে সেগুলো, কিছু কেনা বা বিক্রির ছলে হাজার হাজার বার হাত বদল হচ্ছে প্রতিটা নোট। হাতে হাতে নোংরা হয়ে যাচ্ছে, ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে আসছে সেগুলো। তারপর এক সময় পুরো সিরিজের পচা নোটগুলো বাণ্ডিল বাঁধা অবস্থায় আসছে বাংলাদেশ ব্যাংকে, পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে সেগুলো, ছেপে দেয়া হচ্ছে নতুন নোট।

কিন্তু প্রত্যেকটা নোট কি ফিরে আসছে? আসছে না। কিছু হারিয়ে যাচ্ছে, কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পুড়ে, কিছু ডুবে যাচ্ছে পানিতে, কিছু মাটির নিচে পুঁতে রাখছে কোন কৃপণ। তার মানে এক কোটি টাকা ছাপলে হয়ত দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত হাজার বিশেক ফিরলই না কোনদিন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমি যদি প্রতি কোটিতে বিশ হাজার করে টাকা বানাই, তবু আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে তার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, ইনফ্লেশন তো হচ্ছেই না, বরং টাকাটা সার্কুলেশনে থাকার ফলে দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে।

আমার সীমিত জ্ঞানে আমি ভেবে দেখলাম, এর ফলে আমি নিজের যথেষ্ট উপকার করছি বটে, কিন্তু কারও কোনও ক্ষতি করছি না। ইতিমধ্যে যদিও বেশ খানিকটা ক্ষতি করে দিয়েছি অনেকের, অনেকে ফেঁসে গেছে বাতিল হয়ে যাওয়া ৬৮০৭০৯৭২ নোট নিয়ে, অনেকে হয়ত ঝামেলায় পড়বে নিজের অজান্তে—কিন্তু এ ভুল আর শুধরাবার কোন উপায় নেই। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর না করলেই তো হল।

মোট কথা, সাত-পাঁচ ভেবে স্থির করলাম টাকা বানানো ছেড়ে দেয়ার কোন অর্থ হয় না!

পরদিন সকালে উঠে একটা পাঁচ টাকার নোট তৈরি করলাম। কোন অসুবিধে হল না। হওয়ার কথাও নয়। দশ টাকার নোট যখন পারি, তখন পাঁচ বা একশো টাকার নোট তৈরি করতে না পারার কোন কারণ নেই। আসলে দশ দিয়ে শুরু করেছিলাম, ঐ নোটটাই ছিল শেষ সম্বল, তাই ওটারই প্রতিলিপি তৈরি করে গিয়েছি আমি কোন কিছু চিন্তা না করেই। প্রত্যেকটা নোটের নম্বর যে এক ও অভিন্ন সেটা পর্যন্ত খেয়াল করিনি। ফলে ব্যাংকের কোন টেলারের চোখে পড়ে গেছে ব্যাপারটা নোট গুনতে গিয়ে।

গোটা বিশেক পাঁচ টাকার নোট পেলাম। প্রত্যেকটার একটা করে ডুপ্লিকেট করে দশ টাকার নোটগুলো সব নষ্ট করে দিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। পাঁচ টাকার নোটগুলোকে বদলে বিশটা দশ টাকার নোট নিয়ে ফিরলাম। সেগুলোকে দ্বিগুণ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার, চারটে একশো টাকার নোট নিয়ে ফিরে এলাম। প্রত্যেকটা একশো টাকার নোটের চারটে করে কপি করে চার পকেটে রাখলাম চার সেট, তারপর বেরোলাম আবার। ষোলটা দোকানে দশ-বিশ টাকার জিনিস কিনে ভাঙালাম ষোলটা নোট, বাসায় ফিরে এলাম একরাশ দশ, পাঁচ আর এক টাকার ভাংতি নিয়ে। প্রত্যেকটার দুটো করে কপি করে এক সেট দিলাম হীরাকে, দুই সেট রাখলাম আমার দুই পকেটে—এক সেট শেষ না করে অন্য সেটে হাত দেব না।

আরও কায়দা করলাম। নারায়ণগঞ্জ থেকে নিজের নামে মানি অর্ডার করলাম ঢাকার ঠিকানায়। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যখন টাকাটা আসছে তখন সম্পূর্ণ অন্য টাকা আসছে আমার হাতে, চট করে দ্বিগুণ করে ফেলছি নতুন নোটগুলো। ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে জমা দিলাম এক সেট—যখন তুলছি তখন আমার হাতে আসছে সম্পূর্ণ

BanglaBook.org

অন্য টাকা। তাছাড়া কেনাকাটাগুলোও একটু সতর্কতার সাথে করছি—এমনভাবে করছি যেন এক দোকানে দু'মাসের মধ্যে আর দ্বিতীয়বার যাওয়া না পড়ে।

আর হ্যাঁ, নিয়মিত জমাতে শুরু করলাম ব্যাংকে। একবারে বেশি টাকা দিই না কখনও, প্রতি সপ্তাহে হাজার টাকার বেশি না। দুই ব্যাংকে দুটো অ্যাকাউন্টে জমাচ্ছি, একটা আমার নামে, একটা হীরার। ইতিমধ্যে ধানমণ্ডির তের নাম্বার রোডে লেকের উত্তর পারে সুন্দর একটা একতলা বাড়িতে উঠে এসেছি আমরা, খুঁজে দিয়েছে বাবলা। সামনে পিছনে বিরাট লন। নানান রকমের গাছ গাছালি লাগানো আছে ছবির মত সুন্দর করে। বাড়িটা এতই পছন্দ হয়ে গেল আমাদের যে ওকে লাগিয়ে দিলাম এটা বিক্রি হবে কিনা সে খোঁজ বের করবার জন্যে। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাজদা কিনে নিয়েছি, ভাল একজন ড্রাইভারও জোগাড় হয়ে গেছে।

বেশ তরতর করে কেটে যাচ্ছে দিন। একটা জিনিস বাদ দিতে পারিনি আমি, সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে আকবর মিয়ার রেস্তোরাঁয় যাওয়া। গাড়িটা একটু দূরে রেখে হেঁটে গিয়ে ঢুকি প্রায়ই। গল্প-গুজব, চা, আড্ডা, তাসে বেশ কাটে সময়। বাবলাকে আগে থেকে টিপে দিয়েছিলাম যেন আমার সম্পর্কে কোন কথা কেউ জানতে না পারে, নিজের স্বার্থ চিন্তা করেই চেপে গিয়েছিল সে। বাড়িওয়ালাকে রাজি করিয়ে বাড়িটা যদি ও আমাকে গছাতে পারে তাহলে কমিশন বাবদ বিরাট একটা অঙ্ক এসে যাবে ওর পকেটে, কাজেই ও এখন আমার বুজুম ফ্রেণ্ড, আমার সম্পর্কে টুঁ শব্দটি করেনি সে কারও কাছে। কিন্তু মানুষ বড় ধুরন্ধর জীব। কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়ে গেল সব শালা। হয়ত আমার জামা-কাপড় আর হাবভাবের পরিবর্তনই ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল ওদের, বুঝে গেল ওরা কিভাবে যেন অনেক টাকা কামিয়েছি আমি। যখন তখন বেমক্কা প্রশ্ন করে বসে একেকজন—দোস্ত, কি করে কি করলি বল না শুনি। বললে কি হয়, তোরটা তো আর কেড়ে নিতে যাচ্ছি না আমরা।

ডেকে পাঠালাম বাবলাকে। বললাম, ইনশিওরেন্সে কি লাভ সেটা যদি আমাকে বোঝাতে পারে তাহলে এক লাখের একটা পলিসি নিতে পারি। ঝাড়া একটি ঘন্টা বক্তৃতা দিল সে। আমি টেপ-রেকর্ড করে নিলাম সবটা। পলিসি নিলাম ঠিকই, কিন্তু তারচেয়ে বড় উপকার হল বার কয়েক বাজিয়ে ওর লেকচারটা মুখস্থ করে নেয়ায়। একদিন সবার সামনে 'বল না, বল না' করে যেই জ্বালাতন শুরু করল একজন, অমনি লাগাম ছেড়ে দিলাম মুখের। পঁয়ত্রিশ মিনিট পর বহু কষ্টে প্রায় হাতে-পায়ে ধরে থামানো হল আমাকে, সবাই বুঝে গেছে যে বীমা ছাড়া জীবনটাই বৃথা। এরপর আর কেউ সাহস পায়নি আমাকে ঘাঁটতে। ধরে নিয়েছে বীমার দালালী করেই খুলে গেছে আমার কপাল।

ভাল কথা, তেহাত্তরের গোড়ার দিকেই কিন্তু কিনে নিয়েছি আমরা বাড়িটা। মালিকটা বাবলার বিরক্তিকর ঘ্যানর ঘ্যানর সহ্য করতে না পেরে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন অবাস্তব একটা দাম হেঁকে দিল। মনে করল ভাগবে ব্যাটা এবার। দুঃসংবাদটা আমাকে জানিয়ে ভগ্নমনোরথ বাবলা কেটে পড়বার তালেই ছিল, আমি বললাম, কুছ পরোয়া নেই, গো অ্যাহেড। যা চায় তাই দেব। সেদিনই বায়না হয়ে গেল, একমাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি কমপ্লিট। ঐ তরফ থেকে কিছু বাগিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমার দেয়া ফাইভ পার্সেন্ট কমিশনেই মিরপুরের ওদিকে ছোটখাট একটা বাড়ি কিনে ফেলেছে বাবলা, হোণ্ডা কিনে নিয়েছে একটা—আলাদা একটা চেকনাই এসে গেছে চেহারায়। ও-ও খুশি, আমিও খুশি।

বিকেল বেলা যখন লনে বসি, আমি আর হীরা, বাচ্চারা মনের সুখে খেলে বেড়ায়

BanglaBook.org

মাঠময়, হু-হু করে আসে লেকের ঠাণ্ডা, প্রাণ জুড়ানো হাওয়া, বেয়ারা চা দিয়ে যায়, তখন কেমন যে ভাল লাগে বলে বোঝাতে পারব না। তরতর করে কেটে গেল দুটো বছর।

সত্যিই স্বপ্নের মত কাটছিল সময়, এমনি সময় হাজির হল উটকো ঝামেলা।

রাজার হালে ছিলাম। যতক্ষণ খুশি ঘুমিয়ে যখন খুশি উঠতাম আমরা সকালে। ইতিমধ্যে খাইয়ে দাইয়ে ইস্কুলে রওনা করে দিয়েছে আয়া ছেলেমেয়েদের। টেবিলে সাজানো আছে ব্রেকফাস্ট। নাস্তা সেরে ভাবতে বসি কি করা যায় আজ। কিছু না কিছু পেয়েই যাই। যেটা ভাল লাগে মন দিই তাতে। যখন যা চাই সেটা পেতে হলে কত খরচ হবে চিন্তা করার দরকার নেই, দয়া করে ভাল লাগলেই হল, ব্যস সে জিনিস আমাদের। বছর খানেক প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল হীরার বাগানের শখ, ওর পাল্লায় পড়ে আমাকেও প্রচুর খাটতে হয়েছে ওর বাগানের পিছনে। ভালই লেগেছে আমার। এত সুন্দর করে বাগান সাজিয়েছি আমরা দু'জন, দেখলে মনে হবে স্বপ্ন দেখছেন। তারপর মাথায় চাপল ওর বেড়াবার শখ। চুয়াত্তরের শেষের দিকে বাচ্চাদের পরীক্ষার পর লম্বা একটা ট্যুর দিয়ে এলাম আমরা সারা ভারতবর্ষে। কলকাতা-হিল্লী-দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজ অজন্তা-ইলোরা কিছুই বাদ দিইনি। যখন যেখানে গিয়েছি, সব চেয়ে সেরা হোটেলে উঠেছি। যা পছন্দ হয়েছে কিনেছি।

দীর্ঘ দুটো মাস ঘুরে ফিরে এলাম আমরা ঢাকায়। এসে দেখি লেটার বক্সটা একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে চিঠিপত্রে। এতই বেশি যে আঁৎকে উঠলাম ভয়ে। এবং মস্ত ভুল করলাম প্রথমে আধাআধি পরিমাণ ঝপাৎ করে ফেলে দিলাম ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে, তবু দেখি অনেক। যেগুলো ছিল তার থেকে আবার অর্ধেক ফেলে দিলাম। কী যে ফেলে দিলাম বুঝতে পারিনি তখন। সেটা ছিল ফেব্রুয়ারি। মার্চের মাঝামাঝি এসে হাজির হল একজন লোক।

চৈত্রের উথালপাতাল হাওয়ায় শুয়ে আছি বারান্দার ইজিচেয়ারে। হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসেছে ছেলেমেয়েরা মাস্টারের কাছে। সন্ধ্যা হয় হয়। আর এক কাপ কফি খাব, না ওভালটিন খাব ভাবছি, এমনি সময়ে এল লোকটা।

'আমার নাম মল্লিক,' বলল লোকটা। 'শারফুদ্দিন মল্লিক। ইনকাম-ট্যাক্সে আছি। ইন্সপেক্টর।'

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল হীরা, কোনমতে সামলে নিল চৌকাঠ ধরে।

'বড় সুন্দর বাড়িটা,' চারপাশে চেয়ে বলল লোকটা। 'যেমন ভেতর থেকে, তেমনি বাইরে থেকে।'

'আমার স্ত্রীর পছন্দ। বেশ নিরিবিলি। গাড়িঘোড়ার হট্টগোল নেই,' এছাড়া আর কি বলব বুঝে উঠতে পারলাম না। পিলেটা কিন্তু চমকে গেছে একেবারে। ভিতর ভিতর হার্টবিট বেড়ে গেছে দ্বিগুণ।

'তা ঠিক,' বলল লোকটা। 'এই এলাকাটাই সবচেয়ে নিরিবিলি। তবে এরকম ছবির মত বাড়ি আর একটাও নেই। আমার ছেলেটা তো প্রায়ই আসে এখানে খেলতে।'

'তাই নাকি?' একটু অবাক হলাম।

'হ্যাঁ। দেখেছেন নিশ্চয়ই। ফর্সা, মোটাসোটা।'

'ওহ-হো, পিন্টুর কথা বলছেন? নাইস বয়। আপনারই ছেলে বুঝি? আমার স্ত্রীর তৈরি পুডিং খুব পছন্দ ওর। সেই ছেলেটা না, হীরা?'

বিবর্ণ মুখে মাথা ঝাঁকাল হীরা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর চুলোয় কি যেন চড়ানো আছে। অর্থাৎ কেটে পড়ল, ঝড়ঝাপটা যা যায় আমার উপর দিয়েই যাক। আমার তাতে

BanglaBook.org

আপত্তি নেই, গোড়াতেই ওকে বলেছিলাম যা করবার আমিই করছি, যদি কোন বিপদ আসে মোকাবিলা আমিই করব ও যেন অযথা চিন্তাভাবনা করে মাথা গরম না করে। তবে ভাল করেই জানি রান্নাঘর না কচু, ওপাশের দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ও এখন।

'অনেকদিন ভেবেছি আপনার সাথে আলাপটা সেরে নেব,' বলেই চলল লোকটা। 'কিন্তু বোঝেনই তো ব্যস্ত মানুষ, সব সময় যেন চেপে আছি ঘোড়ায়। আজ সুযোগ পেয়ে ভাবলাম দেখাটা সেরেই যাই। আজকের এই আসাটা অনেকটা প্রতিবেশীর মত আসা, এক সেন্সে আন-অফিশিয়াল।'

'আসবেন না কেন,' বললাম। 'নিশ্চয়ই আসবেন। ঐ কোনার ছোট্ট বাড়িটায় আছেন না আপনি?'

'হ্যাঁ। আমার শ্বশুর বাড়ির একটা অংশ ভাড়া নিয়েছি। প্রতিবেশীর ভিজিট ছাড়াও আজকের এই হঠাৎ হাজির হওয়ার সাথে পরোক্ষভাবে কিছুটা কাজেরও সম্পর্ক আছে। আপনাকে তো বলেছি, আমি ইনকাম-ট্যাক্সে।'

আলাজিহ্বার কাছে চলে এসেছে আমার কলজেটা। ধুক ধুক করছে। কোনমতে ঢোক গিলে বললাম, 'ইনকাম-ট্যাক্স···ও হ্যাঁ, বলেছেন।'

'পিন্টুর সাথে আপনার ছেলেদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাতে গোলমাল থেকে আপনাকে কিছুটা বাঁচিয়ে দেয়া আমি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করলাম। ব্যাপারটা আমার চোখে না পড়ত তাহলে এক কথা ছিল, কিন্তু জেনেশুনে চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না।'

কি বলছে লোকটা সেই জানে, আমি বিনীত একটা ভঙ্গি নিয়ে বসে রইলাম, কিচ্ছু বুঝলাম না। দুর্বোধ্য বক্তব্য সরলীকরণের প্রয়াস পেল সে এবার।

হঠাৎ চোখে পড়ে গেল আপনার নামটা। চেনা চেনা লাগতে ভাল করে পড়ে দেখলাম ঠিকানাটা। নম্বরটা অবশ্য মুখস্থ ছিল না, কিন্তু তের নম্বর রোড, আর আব্দুল হাকিম নাম দেখে বুঝে নিলাম আপনিই হবেন। ভাবলাম, আগে ভাগেই আপনাকে একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখা ভাল।'

'কিসের ইঙ্গিত?'

'মানে একটু আভাস আর কি। আপনার নামে একটা কড়া চিঠি আসছে ইনকাম-ট্যাক্স অফিস থেকে। ডাকা হয়েছিল আপনাকে। একটা ফর্ম পাঠানো হয়েছিলঃ যেহেতু আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে আপনার উপার্জন আয়কর দানযোগ্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারিখ পড়েছিল। আপনি যথাসময়ে হাজির না হওয়ায় এবার আসছে কড়া একটা চিঠি।'

'কিন্তু···'

'আমি জানি,' বলল লোকটা। 'আমার জানা আছে ঢাকায় ছিলেন না আপনি দু'মাস। কিন্তু যে ভদ্রলোক আপনার ফাইলের চার্জে আছেন ব্যাপারটা তাঁর জানার কথা নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন উপেক্ষা করেছেন আপনি ঐ নোটিসটা। ভয়ানক ত্যাঁদোড় লোক। চিঠিটা ছাড়বার আগেই আপনার হাজির হয়ে যাওয়া দরকার। যদি তাকে বোঝাতে পারেন যে কোন কারণে খোয়া গেছে আসলে প্রথম নোটিসটা, তাহলে বেঁচে যাবেন অনেক ঝামেলা থেকে। আগামীকালই যদি হাজির হন গিয়ে, বলেন যে শারফুদ্দিন মল্লিক সাহেব বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে নোটিসের কথা শুনে খোঁজ নিতে এসেছেন, তাহলে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে কাজটা।'

এরপর এইচ সেকশনের ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার সৈয়দ আশরাফ আলীর যে

BanglaBook.org

ভয়াবহ বর্ণনা দিল লোকটা, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। বোঝা গেল সৈয়দকে দু'চোখে দেখতে পারে না মল্লিক। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হল, আমাকেও দু'চোখে দেখতে পারে না মল্লিক। আমাকেও ভয়ানক ত্যাঁদোড় লোক মনে করে। আমাকে দিয়ে সৈয়দের বিষ ঝাড়াতে চাইছে, নাকি সৈয়দকে দিয়ে টিট করতে চাইছে আমাকে, সেটা যদিও বুঝতে পারলাম না, মনে হল, বন্ধুবেশী শারফুদ্দিন মল্লিক নেহাত সহজ লোক নয়। খুব সম্ভব আমার ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য খুবই কষ্ট দিয়েছে ওর ঈর্ষাকাতর মনে। এমনও হতে পারে, ভাল করে খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে, আমার নামে ফাইলটা ওপেন করেছে এই মল্লিকই।

যাই হোক, খানিকক্ষণ বাচ্চাদের নিয়ে গল্প হল, খানিকক্ষণ চলল রাজনীতি—দেশটা যে একেবারেই রসাতলে যাচ্ছে, সরকারের প্রত্যেকটা নীতি, প্রতিটা পদক্ষেপই যে মারাত্মক ভুল, আমি আর মল্লিক ছাড়া দেশের আর সবার মধ্যেই যে চরম দুর্নীতি ঢুকে গেছে, ইত্যাদি ব্যাপারে একমত হলাম, বাড়িটার আরও খানিক প্রশংসা করল সে, আগামীকাল সৈয়দের কাছে গিয়ে কি বলতে হবে সে ব্যাপারে খানিক তালিম দিল, তারপর বিরক্ত করার জন্যে এবং সন্ধেটা মাটি করে দেয়ার জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। এমনি সময়ে হীরা বেরিয়ে এল, পিছনে খাঁচা ঢাকা একটা প্লেট হাতে বাবুর্চি। কিছু না, মল্লিক সাহেবের বিবির জন্যে যৎসামান্য হাঁড়ি-কাবাব। সালাম বিনিময়ের পর লোকটার পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল বাবুর্চি। হীরা ফিরল আমার দিকে।

'এবার কি হবে?'

বললাম, 'জানি না। তবে ঘাবড়াবার কিছুই নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার বলার ভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের অনিশ্চয়তা টের পেল হীরা। বলল, 'আমি জানতাম! আমি ঠিক জানতাম, আগে হোক, পরে হোক ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। জানতাম, আকাশ ভেঙে পড়বে…' বলতে বলতে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল ও। 'কি হবে এখন! কোথায় গিয়ে দাঁড়াব! ছেলেমেয়ে নিয়ে…'

বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কোন লাভ হল না। মিনিট দশেক পর হাল ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। বেশ অনেক দিন পর গিয়ে হাজির হলাম আকবর মিয়ার আড্ডায়। আমাকে পেয়ে খুব খুশি হল সবাই। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত কাচ্ছু খেলে ফিরে এলাম। দেখলাম ঘুমের ভান করে পড়ে আছে হীরা বিছানায়। ওর ভান ভাঙালাম না। জামা-কাপড় ছেড়ে সাবধানে, যেন জেগে না যায়, উঠে পড়লাম খাটে, তিন মিনিটেই ঢলে পড়লাম গাঢ় ঘুমে।

পরদিন দুরুদুরু বক্ষে উঠতে শুরু করলাম ইনকাম-ট্যাক্স অফিসের সিঁড়ি বেয়ে। মনে হচ্ছে আধ মন ওজনের এক একটা জুতো টেনে তুলছি উপরে। বেশি খুঁজতে হল না, চট করেই পেয়ে গেলাম নেমপ্লেট লাগানো অফিসরুম, স্লিপ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে। ভিতর থেকে তর্জন-গর্জনের আওয়াজ আসছে। আধ ঘন্টা পর বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল এক মাঝবয়েসী লোক। ডাক পড়তেই মুখ চুন করে ঢুকলাম।

আমাকে পিওনের মত দাঁড় করিয়ে রেখে আমার বক্তব্য শুনল সৈয়দ আশরাফ আলী, আপাদমস্তক দেখল বাঘের চোখে। এক নজরেই বুঝে নিলাম, ভয়ানক বদরাগী লোকটা। কোন রকম করুণা তো দূরের কথা, এর কাছে সাধারণ ভদ্রতা আশা করাও বৃথা। একটা বেল টিপে দিয়ে বিরক্তির সাথে ভুরু কুঁচকে বসবার ইঙ্গিত করল আমাকে। বসলাম খটখটে কাঠের চেয়ারে। বেয়ারা আসতেই সেকশন থেকে আমার ফাইলটা

BanglaBook.org

নিয়ে আসবার হুকুম হল। ফাইলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে এজিদের মত কঠোর হয়ে উঠল সৈয়দের চোখমুখ। প্রমাদ গুনলাম।

'আপনার কপাল ভাল, মল্লিকের কাছে খবর পেয়ে আগে ভাগেই এসে পড়েছেন। দেখা যাচ্ছে, বাহাত্তর-তেয়াত্তর, তেয়াত্তর-চুয়াত্তর, চুয়াত্তর-পঁচাত্তর, এই তিন বছর কোন ট্যাক্স রিটার্নই সাবমিট করেননি আপনি। কেন?'

প্রশ্নটা করেই এমন ভাবে ভুরু নাচাল লোকটা যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। এমনিতেই কোন অফিস আদালতে গেলে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগি আমি। আমি জানি সরকারি বড় বড় পোস্টে যারা কাজ করে তারা আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে, আরও অনেক বুদ্ধিমানকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তারপর পেয়েছে ওরা এসব চাকরি। কিন্তু তাই বলে আর সবাইকে গরু-ছাগল মনে করবে কেন? ধরেই নিয়েছে আমরা আর সবাই চোর-বাটপার। হাইকোর্টের গম্বুজের উপর থেকে দয়া করে দৃষ্টি ফেলছে পাপীতাপীদের ওপর। সবাই এরকম তা নয়, ভাল লোকও আছে, কিন্তু এই লোকটার ব্যবহারে ছ্যাঁৎ করে আগুন ধরে গেল আমার সর্ব অঙ্গে। ভুলে গেলাম কি শিখিয়ে দিয়েছিল শারফুদ্দিন মল্লিক। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নিজের পায়ে কুড়োল মেরে বসলাম নিজেই।

'করিনি,' বললাম, 'তার কারণ আছে। একটু মাথা ঘামালেই বুঝতে পারবেন। খুব সহজ। গত তিনটে বছর কোন ইনকাম হয়নি আমার।'

আমাকে ঠিক কায়দা মত ঠেসে ধরবার জন্যে প্রস্তুত ছিল লোকটা, কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি এমন কাঁচা কথা বলে বসব আমি। খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে, তারপর পাগলের মত পাতা উল্টাল ফাইলের, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। চোখ তুলল আবার।

'আশ্চর্য! ধানমণ্ডিতে বাড়ি আছে আপনার, তার ভ্যালু অ্যাসেস করা হয়েছে দুই লাখ টাকা, আসলে ওর দাম হবে তার সাতগুণ, মাজদা গাড়ি আছে আপনার, তার মেইনটেন্যান্স আছে। খাওয়া-পরা বাদই দিলাম, ড্রাইভার, বাবুর্চি, চাকর, আয়া, ছেলে মেয়েদের মাস্টারের বেতন আছে—এর পরেও আপনি বলতে চান গত তিনটে বছর কোনই রোজগার হয়নি আপনার? একেবারে কিছুই না?'

'দেখুন, মিস্টার আলী,' বললাম। 'খাওয়া-পরা বাদ দিয়ে কেন মিছেমিছি কষ্ট করছেন? আপনার সব প্রশ্নেরই সদুত্তর দিচ্ছি। আমি একজন আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা নিরীহ নাগরিক। ইনকাম ট্যাক্সের নিয়ম-কানুনও খুবই ভাল জানা আছে আমার (আসলে কিন্তু জানি না)। আসল কথা যদি শুনতে চান, বলি। আমি নিতান্তই কৃপণ লোক। মাজদা গাড়িটা তেল খায় খুব কম, অতি যৎসামান্য। ধরতে গেলে খায়ই না। আর আমরা পিছনের বাগানের কলাটা, মুলোটা, কচুটা খেয়ে থাকি। পরার কাপড় সব সেলাই করে আমার স্ত্রী। মাস্টার, ড্রাইভার, বাবুর্চি, আয়া, চাকর সবাই ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে আমাকে, বেতন নেয় না। কাজেই আমার রোজগারের প্রয়োজন পড়ে না।'

'হোয়াট!' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সৈয়দ সাহেব। 'কি বললেন? ইয়ার্কি মারছেন আপনি আমার সাথে? আপনি জানেন, আমি…' রাগের ঠেলায় ধুম করে কিল মেরে বসল অফিসার টেবিলের উপর।

'আহা, চটছেন কেন? আপনি আমার স্ত্রীর ছোটভাই হন যে ঠাট্টা করব। রাগ লাগছে? বলেন তো আপনার চাপরাশীটাকে ডেকে দিই, যত খুশি মেজাজ দেখান্ ওর ওপর। আমার ওপর খামোকা রাগ করছেন। আমি যা বলছি ঠিকই বলছি।'

বজ্রপাত হল যেন ঘরটায়। চেহারা দেখে মনে হল এক্ষুণি হার্টফেল করবে

BanglaBook.org

লোকটা। ঘাবড়ে গিয়ে লোকজন ডাকব কিনা ভাবছিলাম, এমন সময় দেখলাম, না সামলে নিয়েছে। রক্ত ফিরে আসছে কাগজের মত সাদা হয়ে যাওয়া মুখে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল লোকটা কয়েক সেকেণ্ড, তারপর চোখ খুলল। খুনীর চোখ। ক্ষমতার দর্প কাকে বলে দেখলাম সেদিন।

'পাঁচ লাখ···' কথাটা বলতে গিয়ে ভেঙে গেল লোকটার গলা, ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলাম আমি। কেশে গলা পরিষ্কার করে আবার শুরু করল, 'পাঁচ লাখ টাকা রয়েছে আপনার ব্যাংকে, তার থেকে বছরে কম করে হলেও পঁচিশ হাজার টাকা সুদ···'

'আসতে পারত,' বললাম। 'কিন্তু আসে না। একটু যত্নের সাথে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, ওটা সেভিংস নয়, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। এক পয়সাও সুদ পাই না আমি ও থেকে। আগেই বলেছি আমি আপনাকে, রোজগারের প্রয়োজন পড়ে না আমার, তবে একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে ভদ্রতা শিক্ষার একটা স্কুল খুলবার ইচ্ছে আছে। তখন হয়ত কিছু ট্যাক্স পেলেও পেতে পারেন। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার?'

নেই। আমি বুঝে গেছি, সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে ভস্ম হয়ে যাব। উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ যা-তা কাণ্ড করে বসায় ভয়ানক চটে গিয়েছি আমি নিজের উপর। কিন্তু ছোঁড়া ঢিল ফেরে না।

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আশরাফ আলী, 'খুব শীঘ্রি টের পাবেন আপনি কত ধানে কত চাল হয়। আপনার মত অনেক ইয়ে আমি টিট করে ছেড়ে দিয়েছি। যেতে পারেন এখন, প্রয়োজন মনে করলে ডাকা হবে আবার।'

দরজার কাছে এসে পিছন ফিরে দেখলাম লাল একটা কলম দিয়ে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে কি সব লিখছে লোকটা আমার বিরুদ্ধে। কলম দিয়ে পিষে ফেলছে আমাকে। বুঝলাম, রওনা হয়ে গেল স্টিম রোলার, থেঁতলে মিশিয়ে দেবে আমাকে মাটির সঙ্গে।

এক মাসের মধ্যে যখন ইনকাম-ট্যাক্স অফিস থেকে কোন রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন ভাবলাম মরে-টরে গেল না তো? কিংবা বদলি হয়ে গেল লোকটা? একদিন গেলাম। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে দেখে এলাম, কিসের কি, দিব্যি ধমক মারছে লোকটা এক কাঁচুমাচু বুড়োকে। তাহলে কি আর কোন আবদুল হাকিম চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হল ওর স্টিম রোলারের তলায়? উঁহুঁ, অসম্ভব। নাম, ধানমণ্ডির বাড়ি, মাজদা গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স সব মিলে যেতে পারে না। আমিই। কোন সন্দেহ নেই তাতে। তবে? ও তরফ থেকে আক্রমণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

আরও কয়েক সপ্তাহ কেটে যেতে ভয়ও কেটে যেতে শুরু করল আমার। আড়াই মাস যখন পেরিয়ে গেল, প্রায় ভুলেই গেলাম আমি ওসব কথা। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়েছে, অবাক হয়ে ভেবেছি লোকটা কিল খেয়ে হজম করে নিল কেন? নিজের কোন দুর্বলতা আছে সৈয়দ আশরাফ আলীর? তাই আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি? মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম—তাই হবে। কারণ যে-কোন অসৎ অফিসারকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেয়া একজন বেকার লোকের জন্যে মাত্র দশদিনের মামলা। আমার পিছনে লাগলে আমিও ছেড়ে দেব না বুঝেই খুব সম্ভব চেপে গেল লোকটা বুদ্ধিমানের মত।

কিন্তু ভুল ভাঙল আমার কিছুদিনের মধ্যেই।

শখ হল, ইউরোপ ট্যুরে যাব ফ্যামিলি নিয়ে গরমের ছুটিতে। ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করতেই টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের। হয়ত মনে করল ওরা ভাগবার মতলবে আছি আমি, পার্সপোর্ট তো পেলামই না, ডাক পড়ল আমার আই. বি. অফিসে। ডেকে পাঠিয়েছেন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডি.এস.পি।

BanglaBook.org

বিচার বা ওরকম কিছু না। পাঁচজন বড়বড় অফিসার বসেছেন ওপাশ থেকে টেবিলটা ঘিরে, আমি বসেছি এপাশে। কেন্দ্রবিন্দু। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নেই, উকিল-মোক্তার নেই। কোন হাঁক-ডাক, হম্বিতম্বি, তর্জন-গর্জন নেই—অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে আমাকে জানানো হল এটা জাস্ট একটা ইনফরমাল মীটিং, আমার সহযোগিতা পেলে একটা বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হতে পারে, যার ফলে কোর্টে দৌড়াদৌড়ির বিচ্ছিরি ঝামেলা, অনর্থক উকিল-মোক্তারের পিছনে টাকার শ্রাদ্ধ, সময়ের অপব্যয়, ইত্যাদি থেকে উভয় পক্ষেরই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হতে পারে। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল আমার। নাম-ধামের দরকার নেই, সবাই অত্যন্ত উঁচু র‍্যাংকের অফিসার—একজন ইনকাম-ট্যাক্স থেকে, একজন সি.আই.ডি. থেকে, একজন অ্যান্টিকোরাপশন থেকে, আর একজন সিক্রেট সার্ভিস থেকে এসেছেন, আমার মুখোমুখি ওপাশের চেয়ারে ডি.এস.পি. সাহেব নিজে। কথাবার্তা যা হল বিস্তারিত সে-সবের মধ্যে না গিয়ে মূল ব্যাপারটা তুলে ধরা যাকঃ

'আব্দুল হাকিম সাহেব, আপনার একটা বাড়ি, গাড়ি আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। ঠিক?'

'ঠিক। তবে ব্যালেন্স খুব বেশি না। মাত্র পাঁচ লাখ। তাও আবার কারেন্ট অ্যাকাউন্টে।'

'যার কোন ইনকাম নেই তার জন্যে অঙ্কটা বিরাট বলে মনে হচ্ছে না আপনার? যাই হোক, উপার্জন নেই, ব্যাংক থেকে কোন সুদ আসছে না, তাহলে চলছে কি করে আপনার?' আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করল। 'কলা-মুলো, কচু খাওয়ার কথা আমরা জানি। কিন্তু এখন তো আর এই উত্তরে চলবে না, মিস্টার হাকিম। আমাদের হাতে প্রমাণ আছে, সত্যিই প্রমাণ আছে, যে গত তিনটে বছরে শুধু টুকিটাকি জনিসই কিনেছেন আপনি সাড়ে চার লাখ টাকার। আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করেছি, আপনার মাসিক খরচ আট হাজার টাকার ওপর, যে স্ট্যাণ্ডার্ডে আপনি চলাফেরা করেন, আসলে হয়ত তার চেয়েও অনেক বেশি। ঠিক?'

'ঠিক,' স্বীকার না করে আর কোন উপায় দেখলাম না। ওদের আশ্চর্য দক্ষ তৎপরতার জন্যে মুগ্ধ-কণ্ঠে প্রশংসা করলাম, কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না কেউ। সব যেন পাথর।

'এইজন্যে,' বলল একজন। 'এইজন্যেই ডেকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে, মিস্টার আবদুল হাকিম। ব্যাপারটা কোর্টে গেলে সাজার কথা বাদই দিলাম, যে পরিমাণ ঝামেলা আর পাবলিসিটি হবে, যে রকম কলঙ্ক রটবে আপনার নামে, বুঝতেই পারছেন। আপনাকে সে সবের মধ্যে না ফেলে কোন রকম সমঝোতায় আসা যায় কিনা আলোচনা করে দেখার জন্যেই ডাকা হয়েছে আজ আপনাকে। ব্যাপারটা আপস-নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলেন?'

আমি রাজি হব ধরেই নিয়েছে সবাই। রাজি হয়ে গেলাম।

'গুড! মিস্টার হাকিম, আপনার উপার্জন ঠিক কত আপাতত সে ব্যাপারে আমরা ততটা আগ্রহী নই—যদিও সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং সবটা চুকে যাওয়ার আগে বকেয়া ট্যাক্সের ব্যাপারটা আপনার সন্তোষজনক ভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে,' কথাটা শুনে খাড়া হয়ে বসলাম। কথা বলেই চলল ভদ্রলোক, 'যা বলছিলাম, টাকার অঙ্কটা বড় কথা নয়, আমাদের প্রশ্নঃ আপনার সোর্সটা কি, মানে কোত্থেকে পাচ্ছেন টাকাটা?' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করল, 'মানে, কিভাবে করছেন?'

'কিভাবে করছি? কি কিভাবে করছি!'

BanglaBook.org

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না কারও। ধৈর্য ধরবে বলে প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে যেন সবাই। কারও চেহারায় বিরক্তির আভাস পর্যন্ত প্রকাশ পেল না। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনি চাকরি করেন না, ব্যবসা করেন না, জুয়া খেলেও পয়সা আসে না আপনার। তাহলে কোথা থেকে আসে? কাদের মাধ্যমে, কিভাবে, কখন পাচ্ছেন আপনি টাকা? আর কে কে আছে আপনার সাথে?'

হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। 'কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল সবাই। একজন ঝুঁকে এল সামনে।

'দেখুন, মিস্টার হাকিম, সব স্বীকার করাই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। বাস্তবকে স্বীকার করে নিন। আমরা জানি, অঢেল রোজগার করেন আপনি। রোজগারের একটা উৎস তো থাকতে হবে? আমরা জানতে চাই—অত্যন্ত কৌতূহলীও বলতে পারেন—টেলিফোন বা আর কোন মাধ্যমে কারও সাথে যোগাযোগ না করে, কারও সাহায্য না নিয়ে উপার্জন করা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই আপনার সাথে আরও লোক আছে, কারা এরা, কিভাবে যোগাযোগ রাখছেন আপনি এদের সাথে সবার চোখ বাঁচিয়ে?' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, 'খোলাখুলিই বলি, এ ব্যাপারে একেবারে থ হয়ে গিয়েছি আমরা। যথেষ্ট পরিশ্রম করেও ধরতে পারিনি যোগাযোগের মাধ্যম বা উপায়। আমরা এতই অবাক হয়েছি যে ফাইন বা পেনালটি ছাড়াই যাতে আপনি আপনার বকেয়া ট্যাক্স দিয়ে খালাস পেতে পারেন সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

হাসি এসে গেল আমার। প্রথমে কিছুক্ষণ নাক দিয়ে নিঃশব্দে হেসে তারপর চাপতে না পেরে হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হাসলাম কিছুক্ষণ। হাসির দমক একটু কমে আসতে বললাম, 'তাই বলুন! কয়েক মাস যাবত আমার টেলিফোনে যে খুটখাট নানান রকম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, সেটা ঘটছে আপনাদেরই কল্যাণে। আমার টেলিফোনে কান পাতছেন আপনারা। কয়েক মাস ধরে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, মনে হচ্ছিল ছায়ার মত অনুসরণ করছে কেউ আমাকে, সে-ও নিশ্চয়ই আপনাদেরই লোক?' ওদের মুখ দেখে বুঝলাম মিথ্যে বলিনি। 'তবু বের করতে পারলেন না কেমন করে টাকা আসছে আমার হাতে? আমাদের নতুন দুধওয়ালা, ধোপা আর বাবুর্চিরাও নিশ্চয়ই আপনাদেরই লোক?'

আবার একপেট হেসে নিলাম প্রাণ খুলে। বুঝলাম এই হাসিটা অপছন্দ করছে সবাই, কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারলাম না। হয় না এরকম?—বুঝতে পারছি কাজটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু চাপতেও পারছি না কিছুতেই?—সেই রকম। গম্ভীরভাবে চেয়ে রয়েছে সব কয়জন আমার মুখের দিকে। কঠোর, নিস্পৃহ, ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে বেশিক্ষণ খুশি থাকতে পারলাম না, ধীরে ধীরে চুপসে এল আমার হাসিটা।

'যতটা ভাবছেন, ততটা মজার নয় আসলে ব্যাপারটা,' বলল একজন। 'হাসির ব্যাপার তো নয়ই। মিস্টার হাকিম, আপনার বিরুদ্ধে যেসব তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে তাতে ইচ্ছে করলেই আপনাকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিতে পারি আমরা এখুনি। তখন আর হাসির খোরাক পাবেন না এর মধ্যে।'

এই হুমকিতে যে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হলাম না সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না কারও। আমাকে বাস্তব জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করল একজন। 'ইচ্ছেকৃতভাবে ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার দায়ে জেল হয়ে যেতে পারে আপনার, তা জানেন? আপনার স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের কথা একটু ভেবে দেখুন—কী অবস্থা হবে তাদের? জেলে বসে বেআইনী জুয়ার আড্ডা, বা নারী ব্যবসা, যাই হোক, পরিচালনা করা কি সম্ভব হবে বলে মনে করেন?'

BanglaBook.org

এতক্ষণে বুঝলাম কিসের স্বীকারোক্তি আদায় করতে চেষ্টা করছে এরা আমার কাছ থেকে। এরা ধরে নিয়েছে, চাকরি যখন করছি না, নিশ্চয়ই ব্যবসা করছি, অথচ কিসের ব্যবসা করছি বোঝা যাচ্ছে না, কাজেই নিশ্চয়ই বেআইনী গোপন কিছু করছি। আর গোপন কোন্ ব্যবসায় প্রচুর টাকা রোজগার করা যায়?—জুয়া অথবা নারী ব্যবসা। যুক্তিপূর্ণ ধাপের পর ধাপ ডিঙিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এরা, এ দুটোর যে কোন একটা, অথবা দুটোই করছি আমি।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম আমি, এদিকে নানান ভাবে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা চালিয়ে গেল সবাই—স্বীকার কর, স্বীকার করে ফেল, সেটাই এখন একমাত্র পথ। ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম স্বীকারই করব। হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করলাম সবাইকে।

'আপনাদের কি মনে হয়? কিভাবে রোজগার করছি আমি?'

'দুটোই মাত্র রাস্তা খোলা আছেঃ হয় নারী, নয় জুয়া। নিজে জুয়া খেলেন না যখন, নিশ্চয়ই খেলান। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে ম্যানেজ করছেন সবটা ব্যাপার?' আমার চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন রাখল একজন। 'প্রথমে শোনা যাক এ দুটোর মধ্যে কোনটা করছেন?'

'কোনটাই না,' বললাম। সবাই একসাথে কথা বলে ওঠার উপক্রম করতে হাত তুললাম আবার। 'আমি করছি সম্পূর্ণ অন্য কিছু। টাকা তৈরির ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ জাগেনি আপনাদের মনে?'

ছানাবড়া হয়ে গেল পাঁচজোড়া চোখ। সিক্রেট সার্ভিসের ভদ্রলোক সামলে নিল সবার আগে। বলল, 'কী বাজে কথা বলছেন! অসম্ভব! আপনার আগা-পাশ-তলা সব পরীক্ষা করে দেখেছি আমরা। টাকা ছাপতে হলে মেশিন দরকার, কাগজ দরকার, কালি দরকার, একা একা ইচ্ছে হল টাকা বানালাম সেটা সম্ভব নয়, আরও লোকজনের সাহায্য, সহযোগিতা দরকার, অন্যের সাথে চলাফেরা, ওঠাবসা, মেলামেশা দরকার। অসম্ভব! বাজে কথা বলে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছেন আপনি আমাদের।'

মানিব্যাগ থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিলাম।

'প্রথমে নাম্বারটা মিলিয়ে দেখুন, তারপর নোট দুটো পরীক্ষা করুন যেমন ভাবে খুশি।'

নাম্বার মিলিয়ে দেখেই আঁৎকে উঠল সবাই। নোট দুটো পরীক্ষা করে কোথাও কোন খুঁত বের করতে পারল না কেউ। সবকটা ব্রেন ফুলস্পীডে চালু হয়ে যাওয়ায় গরম হয়ে উঠছে ঘরটা ক্রমে। সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর। এমনি সময়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বললাম, 'খিদে লেগে গেছে, বাড়ি চললাম আমি। যদি আটকাবার চেষ্টা করেন, একটি কথাও বের করতে পারবেন না আমার কাছ থেকে। আপনারা নিজেরাই স্বীকার করছেন, কোন তফাৎ নেই একটা থেকে আর একটার, কারও সাধ্য নেই যে কোন একটাকে নকল বলে। আমাকে ধরে বেঁধে যদি প্রশ্ন করেন, আমি বলব হয়ত টাকশালের নাম্বারিং মেশিনে কোন গোলমাল ছিল, একই নাম্বার পড়ে গেছে পরপর দুটো নোটে—এবং মনে রাখবেন, আমার কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে সবাই। আমাকে আটকাতে পারবেন না কোনভাবেই। কিন্তু কথা দিচ্ছি, পালাবার চেষ্টা করব না আমি—কাল সকাল দশটায় যদি আমার বাসায় দয়া করে পদধূলি দেন, আমি আপনাদের দেখাব কোত্থেকে কিভাবে পাই আমি টাকা।'

দু'মিনিট চিন্তা করবার সময় দিলাম সবাইকে। তারপর বেরিয়ে এলাম অফিসরুম থেকে। কেউ বাধা দিল না। সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। কেউ আটকাল না। ফিরে চললাম বাড়ির পথে। সমান দূরত্ব বজায় রেখে আরেকটা গাড়িকে পিছু পিছু আসতে

BanglaBook.org

দেখে মনে মনে হাসলাম।

পরদিন সকালে হীরাকে পাঠিয়ে দিলাম বাপের বাড়ি, ছেলেমেয়েসহ। সারাদিনের জন্যে। ন'টা পর্যন্ত গড়াগড়ি করলাম বিছানায়, তারপর শেভটেভ করে একেবারে স্নান সেরে বেরোলাম বাথরুম থেকে। কাপড়-চোপড় পরে ফিটফাট হয়ে নাস্তা খেলাম, তারপর গিয়ে বসলাম ড্রইংরুমে। ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়িতে দশটা বাজবার সাথে সাথেই একটা গাড়ি এসে থামল গাড়ি-বারান্দায়। উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালাম। বাবুর্চিকে বলে রেখেছিলাম আগে থেকেই, সবাই বসতে না বসতেই কফি নিয়ে এল ছয় কাপ। সবাইকে সিগারেট সাধলাম, দুজন খায় না, বাকি তিনজন নিল। গ্যাস লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলাম সবার সিগারেট।

আজকে চেয়ারম্যান আমিই, খুক খুক কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলাম।

'আপনাদের আজ ডেকেছি কিভাবে আমি টাকা পাই সেটা দেখাব বলে। কফিটুকু শেষ হলেই ডেমনস্ট্রেশন দেখানো যাবে, কিন্তু তার আগে দু' একটা কথা বলে নেয়া দরকার। আমার বিশ্বাস, কোন অন্যায় কাজ আমি করিনি বা করছি না। কিন্তু আপনাদের এখানে উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে নিজের অজান্তেই বেশ খানিকটা ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়েছি আমি। এই ঝামেলা আমার ভাল লাগছে না। আমি চাই সাদা মনে সবকিছু আপনাদের খুলে বুঝিয়ে দিতে। কোন লুকো-ছাপা না করে পরিষ্কারভাবে মেলে ধরব আমি সব আপনাদের সামনে। বিনিময়ে আমি চাই আপনারাও সাহায্য করবেন আমাকে। কোন অসম্ভব আবদার আমি করব না। আইনের বরখেলাপ করবারও অনুরোধ করব না। আমি আশা করব আপনারা সবাই যেটুকু ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করবেন সেটুকু সহযোগিতা দেবেন আমাকে।'

সবাই বলল তা তো বটেই, কিন্তু আন্তরিকতার সুর ফুটল না কারও কণ্ঠে। চুপচাপ কফি শেষ করলাম আমরা। বেয়ারা এসে নিয়ে গেল খালি কাপ। আবার মুখ খুললাম আমি।

'আপনারা জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে রোজগার করছি আমি। কাল দুটো নোট দেখিয়েছিলাম আপনাদের। অবিকল একরকম দেখতে দুটো নোট। আমার অনুপস্থিতিতে সব রকম পরীক্ষা করে নিশ্চয়ই দেখেছেন ওগুলো আপনারা। কি দেখলেন? খুঁত বের করতে পারলেন কোন?'

মাথা নাড়ল একজন। 'নাহ্। দুটো নোটে একই নাম্বার ···এছাড়া আর কোন ত্রুটি নেই। একেবারে নিখুঁত। কারও সাধ্য নেই যে ধরে।'

'নকল হলে তো নকল ধরবে!' বললাম আমি। 'আসলে ও দুটোই আসল। নকল নোট আমি তৈরি করি না, আসল নোট তৈরি করি। এটাই হচ্ছে আমার রোজগারের রহস্য।'

রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল সবার কাছে। কেউ কিছুই বুঝল না। কাজেই ব্যাপারটাকে আর একটু সহজবোধ্য করবার জন্যে হাত বাড়ালাম সামনে।

'কারও কাছে পাঁচ, দশ বা একশো টাকার নোট আছে?' সবাই পকেটে হাত দিল, কিন্তু আমি চট করে বললাম, 'না, সবাই না। যে-কোন একজন বের করুন যে-কোন একটা নোট।'

একজন একটা দশ টাকার নোট দিল আমার হাতে। তেপায়া টেবিলের উপর বিছালাম সেটাকে, তারপর নোটের পাশে টেবিলের গায়ে দুটো টোকা দিয়ে সবাইকে বললাম ঐ জায়গাটা খেয়াল করতে। এইবার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলাম

BanglaBook.org

নোটের উপর। দেখতে না দেখতে ছায়ার মত আরেকটা নোটের আভাস দেখা দিল টেবিলের উপর, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল অবকিল একই রকম কড়কড়ে তাজা আর একটা নোট। সোফায় হেলান দিয়ে বসলাম। নোট দুটো পরীক্ষা করে দেখতে বললাম উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে।

সবার আগে ছোঁ মেরে নোটটা তুলে নিল সিক্রেট সার্ভিসের ভদ্রলোক, আলোর নিচে ধরে পরীক্ষা করে দেখল, পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে ভাল মত পরখ করল, নাম্বার মিলিয়ে দেখল, তারপর নোট দুটো ধরিয়ে দিল পাশের জনের হাতে। নো কমেন্ট। হাতে হাতে ঘুরল ওগুলো, দু'বার করে পরীক্ষা করল কেউ কেউ। সবার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। দুই মিনিট কাটল বিভ্রান্তি আর অনিশ্চয়তার মধ্যে, তারপর সবাই একসাথে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা।

'বুজরুকি,' বলল একজন। 'হাত সাফাই।'

'দেখুন, মিস্টার হাকিম, ম্যাজিক দেখবার জন্যে এখানে আসিনি আমরা,' বলল আরেকজন।

'অপটিক্যাল ইলিউশনও হতে পারে,' আরেকজনের মন্তব্য।

অনাবিল হাসি হাসলাম।

'আমি জানতাম, আপনাদের বিশ্বাস করানো মুশকিল হবে। তাই সবাইকে একসাথে টাকা বের করতে বারণ করেছিলাম। এটা যে ম্যাজিক বা অপটিক্যাল ইলিউশন নয় সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি আমি এক্ষুণি। চারজন চারটে নোট বের করুন এক, পাঁচ, দশ আর একশো টাকার। আপনারা পাঁচজনেই আলাদা আলাদা ভাবে টুকে নিন নোটগুলোর নাম্বার। আমার হাতে দেয়ার দরকার নেই, আপনাদের একজন একটা একটা করে সাজিয়ে দিন ওগুলো এই টেবিলের ওপর, আমি তৈরি করে দিচ্ছি ডুপ্লিকেট। আমি হাত দিয়ে ছোঁব না, আপনারাই তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন।'

চারজন বের করল চারটে নোট, নম্বর লেখা হল, পঞ্চমজন একে একে সাজাল নোটগুলো, আমি একে একে তৈরি করে দিলাম ডুপ্লিকেট। আমি স্পর্শ পর্যন্ত করলাম না। নোটগুলো পরীক্ষা করে এইবার সত্যিই থতমত খেয়ে গেল ওরা। দুই মিনিট কথা বলতে পারল না কেউ।

'ইয়া আল্লা! এ কী দেখলাম!'

'আজব কাণ্ড! নিজ চোখে না দেখলে···!'

'তারমানে সত্যিই খোদা বলে কেউ আছে!'

'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ···'

'এরপর যে যা বলবে বিশ্বাস করব আমি। কেউ যদি বলে সে আসলে মঙ্গল গ্রহের লোক, অবিশ্বাস করব না। যাই হোক, মিস্টার হাকিম, যত বড় কামেল দরবেশ লোকই হোন না কেন, ফেঁসে গেছেন এবার আপনি। জালিয়াতির দায় এড়াবার কোন উপায় নেই আপনার।'

'আসলে আমি ফাঁসিনি,' বললাম। 'ফেঁসেছেন আপনারা। এ নোটগুলোতে আপনাদের হাতের ছাপ রয়েছে আমারটা নেই,' কে বলল যে ওগুলো আমি তৈরি করেছি, আপনারা নন?' কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করবার সুযোগ দিয়ে বললাম, 'দেখুন, শত্রুর মত ব্যবহার করলে আমাকে শায়েস্তা করতে পারবেন না আপনারা। সবকিছুর একটা সুমীমাংসা চাইছি আমি ঠিকই, বাট নট অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ এ গান।'

'কিন্তু এটা চলতে দেয়া যায় না,' বলল অ্যান্টিকোরাপশন। 'অসম্ভব। টাকা জাল করে পার পেয়ে যেতে পারেন না আপনি কিছুতেই। অন্তত আমার জীবন থাকতে নয়।'

BanglaBook.org

'জাল' শব্দটায় আমার আপত্তি আছে, কিন্তু যাই হোক, বললাম, 'এই জাল যদি বন্ধ হয়ে যায়, আপনারা সবাই যদি নিশ্চিত হতে পারেন যে আর জাল হবে না—তাহলেও কি সন্তুষ্টি আসবে না আপনাদের? তারপরেও কি ঝামেলায় জড়াবেন আমাকে? আপনারাই বলেছিলেন পেনালটি বা ফাইন ছাড়াই বকেয়া ট্যাক্স দিয়ে যাতে খালাস পেতে পারি সে ব্যাপারে সাহায্য করবেন যদি আমি সবকিছু খুলে বলি। আমি সরল মনে আপনাদের সবার চোখের সামনে দেখিয়ে দিলাম কিভাবে টাকা পাই, আপনাদের কথা আপনারা রাখবেন না?'

'বকেয়া ট্যাক্সের ব্যাপারটা সহজেই ব্যবস্থা করে দেয়া যায়,' বলল ইনকাম-ট্যাক্স। 'যদি আমরা বুঝি যে কোন রকম অপরাধী মনোবৃত্তি ছিল না আপনার। ওটা অ্যাডজাস্ট করা এমন কিছু নয়, কিন্তু মিস্টার হাকিম, টাকা জাল করা মস্ত বড় ক্রাইম, ভয়ানক এক অপরাধে লিপ্ত আছেন…'

'প্রমাণ আছে কোন? আপনারা কেউ প্রমাণ করতে পারবেন যে আমি টাকা জাল করছি? বড় জোর বলতে পারেন একই নাম্বারের দুটো নোট পাওয়া গেছে আমার কাছে। সেক্ষেত্রে আমি বলব, কি জানি, নেয়ার সময় নাম্বার মিলিয়ে নিইনি, কে দিয়েছে ওগুলো আমাকে তাও স্মরণ করতে পারব না, আমার মনে হয়েছে টাকাগুলো ঠিকই আছে, তাই নিয়েছি সরল বিশ্বাসে। হয়ত টাকশালের নাম্বারিং মেশিনে কোন গোলমাল থাকতে পারে।'

'কোথায় নাম্বারিং মেশিন?' ভুরু নাচাল সি.আই.ডি. অফিসার। 'এই বাড়ির কোথাও ছাপার মেশিন বা নাম্বারিং মেশিন নেই, সাত দিন আগেই গোপনে সার্চ করে গেছে আমার লোক। আমার চোখের সামনে তৈরি করেছেন আপনি এগুলো।'

এই কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি এতক্ষণ। বললাম, 'তাই নাকি? কোন রকম যন্ত্রপাতি ছাড়াই আপনার চোখের সামনে টাকা তৈরি করতে দেখেছেন আপনি? একটু ভেবে দেখুন তো কোর্টে জজ সাহেবের সামনে, ঘরভর্তি দর্শক, উকিল আর সাংবাদিকদের সামনে আপনার এই বক্তব্যটা কেমন শোনাবে?' হাসলাম। 'হেমায়েতপুরের টিকেট কেটে ট্রেনে তুলে দেয়া হবে না আপনাকে?' সবার মুখের দিকে চাইলাম। 'তার মানে, প্রমাণ করতে পারছেন না আমার অপরাধ। আপনারা জানতে পারছেন না কিভাবে তৈরি করি আমি টাকা, কোনদিন জানতে পারবেন না যদি আমি নিজে না বলি,' সিগারেট সাধলাম আবার সবাইকে। 'কি বলেন? আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার হয়েছে? ব্যাপারটা একটু ভাল করে ভেবে দেখুন আপনারা, আমি তোতাপাখিটাকে ছোলা খাইয়ে আসছি তিন মিনিটের মধ্যে।'

ওদের নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ আলোচনার সুযোগ দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম আমি। পাঁচ মিনিট পর যখন ফিরে এলাম তখনও চাপা গলায় তুমুল তর্ক করছে ওরা। কাজেই আরও ছয় কাপ কফির অর্ডার দিয়ে আরও কয়েকটা ছোলা খাওয়ালাম পাখিটাকে। তারপর ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি? কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন?'

'স্টেলমেট অবস্থায় এনে ফেলেছেন আপনি আমাদের, মিস্টার হাকিম। ড্র না করে উপায় নেই। কিন্তু আপনি যে আপনার কথার মর্যাদা রাখবেন, ভবিষ্যতে আর টাকা জাল করবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়?'

'আগেই বলেছি, আপনারা নিশ্চিত হতে পারবেন। শিওর না হয়ে আমাকে ছাড়বেন কেন? আপনারা যদি এ ব্যাপারে গ্যারান্টি পান তাহলে আমার পিছু ছাড়তে রাজি আছেন তো?'

BanglaBook.org

'না, এর মধ্যে আরও কথা আছে,' বলল অ্যান্টিকোরাপশন। 'আপনার মুখের কথায়...'

'আরও একটু সংক্ষেপ করে ফেলা যাক,' বললাম কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে। 'কিভাবে আমি টাকা তৈরি করি সেটা বলব আমি আপনাদের। যে জিনিসের সাহায্যে তৈরি, সেটা দিয়ে দেব আমি আপনাদের। ইচ্ছে করলে সেটা নিয়ে চলে যেতে পারেন আপনারা। ফলে নিশ্চিত হতে পারছেন, আর টাকা তৈরি করতে পারছি না আমি কোনদিন। বিনিময়ে আমি শুধু চাই আপনারা কথা দেবেন যে আমার বিরুদ্ধে সব চার্জ তুলে নেয়া হবে, অতীতে যা হয়েছে তার জন্যে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না আমার বিরুদ্ধে। সোজা সরল কথা আমার! আপনারা কথা দিন বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে দেবেন আমাকে, ব্যস, আজ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে টাকা তৈরি। আপনারা যদি কথার বরখেলাপ করেন, আমি আমার কথা রাখতে বাধ্য থাকব না।'

'জিনিস!' এই শব্দটা মনে ধরে গেছে সিক্রেট সার্ভিসের। 'তার মানে চোখের ভুল না, কোন একটা জিনিস দিয়ে সত্যিই তৈরি করেন আপনি নোট?'

মাথা ঝাঁকালাম। 'সত্যিই করি। আপনাদের সামনেই করেছি, দরকার হলে আবারও করে দেখাতে পারি। আমার প্রস্তাবে রাজি হলে সেই জিনিসটা দিয়ে দেব আমি আপনাদের, সাথে নিয়ে যান বা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলেন বা আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিন—আপনাদের ইচ্ছে। প্রতিজ্ঞায় অটল থাকব আমি, জীবনে কোনদিন আর টাকা তৈরি করব না।'

কফি এল। দ্রুত চিন্তা চলছে সব ক'জনের মাথায়। গভীর চিন্তায় মগ্ন অবস্থায় চুপচাপ শেষ করল কফির কাপ। সিগারেট কম পড়ায় কফি শেষ করে শোবার ঘরে গেলাম আমি আরেক প্যাকেটের জন্যে, দু'মিনিট পর যখন ফিরে এলাম, দেখলাম নিজেদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর একটা মতৈক্যে পৌঁছে গেছে সবাই। আমি ঘরে ঢুকতেই সবার চোখ স্থির হল আমার উপর। প্রবীণতম অফিসার ঘোষণা করল সিদ্ধান্ত।

'মিস্টার আবদুল হাকিম, আমরা আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি। তার একমাত্র কারণ, রাজি না হয়ে আর কোন উপায় নেই আমাদের। তাই বলে মনে করবেন না, মিথ্যে বলে যা-তা একটা কিছু বুঝ দিয়ে পার পেয়ে যাবেন আপনি। ঠিক আছে, আপনার অতীত ঘাঁটতে যাব না আমরা, কোন চার্জ আনব না আপনার বিরুদ্ধে, পেনালটি ছাড়াই গত তিন বছরের ট্যাক্স দিয়ে খালাস পেয়ে যাবেন আপনি। কিন্তু সেই সাথে আর একটা কথাও জেনে রাখুন, আমরা পাঁচ ডিপার্টমেন্টের পাঁচজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলব আপনাকে যদি কোন চালাকির চেষ্টা করেন। জালিয়াতি এক ভয়ানক গুরুতর অপরাধ। আমরা ইচ্ছের বিরুদ্ধে একজন অপরাধীকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছি বটে, কিন্তু ভুলেও ভাববেন না আপনি যা খুশি তাই করতে থাকবেন, আর আমরা চুপচাপ বসে তামাশা দেখব। সত্য-মিথ্যা যে-কোন চার্জে বিশ বছর আপনাকে জেলের ভাত খাওয়ানো আমাদের জন্যে খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বুঝতে পেরেছেন আমাদের বক্তব্য?'

পরিষ্কার। বুঝতে পেরেছি, যা বলছে একবিন্দু বাড়িয়ে বলছে না ভদ্রলোক। তবে আমিও যা বলেছি একবিন্দু মিথ্যে বলিনি। সত্যিই ছেড়ে দিতে চাই আমি টাকা তৈরি। মাথা ঝাঁকালাম প্রশ্নের উত্তরে।

'ভেরি গুড। এবার শোনা যাক সবটা।'

BanglaBook.org

শুরু করলাম। 'হঠাৎ আবিষ্কার করি আমি ব্যাপারটা। আপনারাও পারবেন। খুবই সহজ। এই যে তেপায়া টেবিলটা দেখছেন?'

'টেবিল?' সবাই চাইল টেবিলটার দিকে। 'টেবিলের সাথে কি...'

'ওটাই সব,' বললাম। চাইলাম অ্যান্টিকোরাপশনের দিকে। 'আপনিই তৈরি করুন প্রথম। যে কোন একটা নোট বের করে রাখুন এই টেবিলের উপর, তারপর নোটটার দিকে চেয়ে একমনে চিন্তা করুন ঠিক ঐরকম আরেকটা পেলে বড় ভাল হয়।'

সামান্য একটু ইতস্তত করল ভদ্রলোক সবার সামনে বোকা বনতে হয় কিনা ভেবে, তারপর এগিয়ে এল। একশ টাকার একটা নোট বিছাল টেবিলের উপর, আমার দিকে একবার কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মন দিল নোটের উপর।

কিছুই হল না।

দশ সেকেণ্ড একদৃষ্টে নোটের দিকে চেয়ে থেকে বাঘের নজরে চাইল আমার মুখের দিকে। কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলেছিল, মাথা নাড়লাম আমি।

'না। ঠাট্টা নয়,' বললাম। 'মনটা স্থির করে তাকান ওটার দিকে।'

সবাই চেয়ে রয়েছে নোটের দিকে। আবার মনস্থির করল অ্যান্টিকোরাপশন। প্রায় সাথে সাথেই টেবিলের উপর আবছা মত ফুটে উঠল একটা নোটের ছায়া। রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রয়েছে সবাই ছায়াটার দিকে। প্রথমে কুয়াশার মত দেখা গেল, তারপর ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল খয়েরি নোটটা। তৈরি হয়ে গেল ডুপ্লিকেট। সোজা হয়ে বসে কপালের ঘাম মুছল অ্যান্টিকোরাপশন, অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অবিকল এক চেহারার নোট দুটোর দিকে, তারপর হাতে তুলে নিল।

'দেখি, আমি চেষ্টা করে দেখি?' এক সাথে বলে উঠল বাকি চারজন।

ঠোঁটে নার্ভাস হাসি নিয়ে একে একে সবাই দেখল। একই ব্যাপার ঘটল প্রত্যেকবারই।

আর কোন সন্দেহ নেই কারও মনে। সোফায় হেলান দিয়ে ব্যাখ্যার জন্যে সবাই চাইল আমার মুখের দিকে। প্রশ্নের অপেক্ষায় আপন মনে সিগারেট টানতে থাকলাম আমি। নীরবতা ভঙ্গ করল সিক্রেট সার্ভিস।

'কিভাবে হল ব্যাপারটা?'

'আমি জানি না,' সত্যি কথাটাই বললাম। 'বছর তিনেক আগে এই টেবিলের পাশে বসে আর্থিক অনটনের কথা ভাবছিলাম, পাওনাদারদের কথা ভাবছিলাম, এমনি সময় শেষ দশ টাকার নোটটা টেবিলের ওপর ফেলল আমার স্ত্রী, বললঃ আমি পারব না, তুমি চালাও সংসার। ওটার দিকে চেয়েছিলাম করুণ চোখে, পরমুহূর্তে দেখলাম দুটো দশ টাকার নোট শুয়ে আছে পাশাপাশি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করল সবাই তেপায়া টেবিলটাকে।

'পোর্টেবল টাকশাল!' বলল একজন। 'কোথায় পেলেন এটা?'

'আমার নানীর কাছ থেকে মা পেয়েছিলেন, তার কাছ থেকে আমি,' আমার মায়ের তরফের বংশ বৃত্তান্ত বললাম সবাইকে ভেঙে, কেউ বিশ্বাস করল কি করল না সে তোয়াক্কা না রেখেই।

'এবার? এবার আমাদের করণীয় কি?' পরস্পরকে প্রশ্ন করল পাঁচজন। উত্তরটা আমি দিলাম।

'আমি আপনাদের বলেছি, যে জিনিস দিয়ে টাকা তৈরি করি সেটা আপনাদের দিয়ে দেব। এটা নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন আপনারা। গাড়ি, বাড়ি, টাকা হয়ে গেছে আমার। এবার আমি ভাবছি মানুষের জন্যে কিছু কাজ করব। কলেজ লাইফে লেখা-

BanglaBook.org

টেখার অভ্যাস ছিল। ভাবছি মাঝে-মধ্যে এক আধটা গল্প লিখলে মন্দ হয় না।'

'যে-কেউ ইচ্ছে করলেই টাকা তৈরি করতে পারে এর ওপর?' অনেকটা স্বগতোক্তির মত প্রশ্ন করল প্রবীণ অফিসার। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রয়েছে নড়বড়ে তেপায়ার দিকে। 'যার খুশি?'

'তাই তো মনে হয়,' বললাম। 'আপনি নিজেও তো তাই দেখলেন।'

ধাঁই করে প্রচণ্ড এক কিল মারল ভদ্রলোক টেবিলের উপর। মড়াৎ করে ভেঙে গেল ওটা এক কিলেই। আওয়াজ শুনে ছুটে এল বেয়ারা-বাবুর্চি। টেবিলটা বাইরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ পেয়ে দু'জন দুটো অংশ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আদেশ পেয়ে গাড়ি থেকে পেট্রল বের করল ড্রাইভার। আচ্ছা করে ভিজানো হল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল টেবিলটা।

যতক্ষণ না পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সবাই চার হাত তফাতে। সব শেষ হয়ে যেতে আমার দিকে একটিবারও না চেয়ে গটমট করে সবাই গিয়ে উঠল গাড়িতে, ভোঁ করে বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে। এদের কারও সাথেই আর দেখা হয়নি জীবনে আমার। কেউ আমাকে বিরক্ত করেনি আর কোনদিন।

এই হচ্ছে গল্প। জীবনে আর কোনদিন টাকা তৈরি করিনি আমি। খাওয়া পরার চিন্তা নেই। মাঝে মাঝে এই রকম একটা দুটো গল্প লিখে কাগজে পাঠাই, কোনটা ছাপা হয়, কোনটা হয় না।

তবে এখনও মাঝে মাঝে তেপায়া টেবিলটার জন্যে দুঃখ হয় আমার। হাজার হোক নানীর আমলের পুরানো জিনিস একটা। কত স্মৃতি জড়িয়ে ছিল ওটার সাথে! দুঃখের দিনে কত টাকা বানিয়েছি ওটার উপর। তবে ওটা ভেঙে জ্বালিয়ে দেয়ায় ভালই হয়েছে একদিক থেকে। সাথে করে নিয়ে গেলে কয়েক দিনের মধ্যেই টের পেয়ে যেত ওরা যে ওটা আর পাঁচটা টেবিলের মতই সাধারণ একটা টেবিল ছিল, টের পেয়ে যেত যে আসলে ওরা তৈরি করেনি টাকাগুলো, ওরা যখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে নোটের দিকে তখন তৈরি করে দিয়েছি আমি ওদের হয়ে। ক্ষমতাটা আমার মধ্যে—টেবিল টেবিলই।

ওদের ধোঁকা দিয়েছি ঠিকই, তবে আমার কথার খেলাফ করিনি কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত। আর একটা টাকাও তৈরি করিনি আমি, করবও না। তাই বলে আর কিছু তৈরি করব না এমন কথা দিইনি আমি কাউকে, দেবও না।

এই ধরুন, দশ লাখ টাকা দামের একটা হীরে বা চুনির আংটি পছন্দ হয়ে গেল, কিংবা আরও দামী কোন জড়োয়া সেট বা অয়েল পেইন্টিং—অবিকল সেই রকম আর একটা তৈরি করে নেয়ায় কোন অসুবিধে নেই, সেটা বিক্রি করাতেই বা বাধা কোথায়? আর সবচেয়ে বড় কথা, কাজটা মোটেই বেআইনী নয়।

বেশ আছি—বুঝলেন?—বেশ চলে যাচ্ছে দিন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঠিক দুপুর বেলা

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। বেলা এগারটা সাতচল্লিশ।

টেবিলের উপর রাখা অ্যালার্ম–ঘড়িটার দিকে চেয়ে বসে রয়েছেন কমরেড ফাজেল আহমেদ।

'কোন ভুল নেই,' ঘোষণা করলেন তিনি ঘড়ির উপর থেকে চোখ না সরিয়ে। 'অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, সব দিক বিবেচনা করেই কর্তব্য স্থির করেছি। নির্ভুল। সবকিছু একেবারে ছকে বাঁধা। কোন ভুল হওয়ার উপায় নেই।'

খাঁচায় পোরা তোতাপাখিটা ঘাড় কাৎ করে চাইল কমরেডের দিকে। নিস্পৃহ, ঠাণ্ডা, কঠোর দৃষ্টি–প্রাচীন, মানব জাতির চেয়েও অনেক, অনেক প্রাচীন, পলকহীন চোখে দেখল নিচে, চেয়ারে বসা লোকটাকে।

'খিদে! খোরাক দে,' বলল পাখিটা।

ঘড়ির উপর থেকে চোখ না সরিয়ে কনুইয়ের কাছে রাখা একটা শ্যাওলা পড়া, কানাভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে হাত দিলেন কমরেড ফাজেল আহমেদ, ভিজানো ছোলার একটা দানা দু' আঙুলে ধরে হাতটা তুললেন মাথার উপর, খাঁচার শিকের ফাঁকে। নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরল সেটা তোতাপাখি, বাঁকা শক্ত ঠোঁট দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেল, দাঁড়ের উপর বসল নড়ে চড়ে।

খোলা জানালা দিয়ে আবছাভাবে ভেসে আসছে মহানগরীর কোলাহল–নিচের রাস্তা দিয়ে নাক ডাকার মত আওয়াজ তুলে চলে যাচ্ছে বেবিট্যাক্সি, হর্ন দিচ্ছে প্রাইভেট কার, লোকজনের জুতোর শব্দ, কাগজ আছে কাগ···জ থেকে চলে যাচ্ছে একজন, ঠুনঠুন বেল বাজাচ্ছে আইসক্রিমওয়ালা, মায়ের হাতের কিল খেয়ে কাঁদছে ফকিরণীর বাচ্চা, বহুদূর থেকে ভেসে আসছে একটা প্লেনের গুঞ্জন ধ্বনি। সব শব্দই পৌঁছুচ্ছে তেতলার এই কামরায়, কিন্তু অস্পষ্ট।

BanglaBook.org

'শোন, কমরেড তোতা,' এগারটা উনপঞ্চাশে বললেন কমরেড ফাজেল আহমেদ। 'নীতিগত বা আদর্শগত ভাবে এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কেবল তারই রয়েছে, যার মধ্যে দূর থেকে সবটা ব্যাপার দেখবার এবং অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করবার ক্ষমতা আছে।'

বড় কাঁটাটা এগারটা পঞ্চাশের মোটা দাগটা স্পর্শ করতেই নিজের ভিতর প্রচণ্ড একটা শক্তি অনুভব করলেন তিনি। 'কার কাছে মানুষ আশা করে? যার ক্ষমতা আছে, তার কাছে। দেশকে আমার অনেক কিছু দেয়ার আছে, তাই দেশ চেয়ে আছে আজ আমারই মুখের দিকে, আশা করছে আমারই কাছে,' চোখেমুখে আশ্চর্য এক দীপ্তি এসে গেল তাঁর। 'আজ সুযোগ এসেছে, সময় এসেছে দেবার। আর দশটা মিনিট। ভেবে দেখ, কমরেড, ঠিক দশ মিনিট পর আমার মুখ থেকে শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই এদেশের সমস্ত খারাপ মানুষ বামন হয়ে যাবে। না, ব্রাহ্মণ নয়, যার যা আকার, ঠিক তার অর্ধেক হয়ে যাবে মুহূর্তে। কল্পনা করতে পার? দেশের যত খুনী, দস্যু, জোতদার, পুঁজিপতি শোষকগোষ্ঠী, মুনাফাখোর, চোরাচালানি, কালোবাজারী; আর দালাল, হ্যাঁ দালাল—যারা মিথ্যার বেসাতি করে, যারা কুকুরের মত পদলেহন করে ক্ষমতার—সবাই, বুঝলে, সবাইকে চেনা যাবে এক নিমেষে। বারোটা বাজার সাথে সাথেই ছোট হয়ে যাবে প্রত্যেকটা খারাপ লোক। প্রত্যেকে।'

'খিদে! খোরাক দে!' বলল তোতাপাখি।

তাজা আইডিয়ার মত একটা কাঁচা ছোলা তুলে ধরলেন কমরেড ফাজেল আহমেদ খাঁচার কাছে।

'আমি জানি, তুমি আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারছ না, কমরেড,' বললেন তিনি। 'আমিই তোমাকে বুলি শিখিয়েছি, তোমার মানসিক গঠন, চিন্তার ধারা সবই জানা আছে আমার। এখন মেনে নিতে পারছ না ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে টের পাবে, এ ছাড়া খারাপ মানুষ চিনবার আর কোন পথ সত্যিই নেই। সমাজতন্ত্র আমরা অবশ্যই কায়েম করব। এদেশের মাটি থেকে সামন্তবাদের মূলোৎপাটনের এই একটিই রাস্তা। অন্তত আমার তো তাই ধারণা।'

গত তিনটে সপ্তাহ চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন কমরেড ফাজেল আহমেদ ব্যাপারটাকে সবদিক থেকে। তিন সপ্তাহ আগে জানালার ধারে ইজিচেয়ারে শুয়ে গোধূলির আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ এই ক্ষমতাটা পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ অনুভব করতে পেরেছিলেন খারাপ মানুষ চিহ্নিত করবার ক্ষমতা এসে গেছে ওঁর মধ্যে।

এই উপলব্ধিতে মোটেই আশ্চর্য হননি তিনি। কারণ, এরকম আগেও হয়েছে এক আধবার। একবার ভিয়েৎনামের যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ার ক্ষমতা এসেছিল ওঁর মধ্যে। সেই যখন হেলিকপ্টার থেকে বৃষ্টির মত বোমা ফেলতে শুরু করেছিল মার্কিনীরা উত্তর ভিয়েৎনামের উপর, তখন। সেবার প্রপেলার থেকে কাঠিন্য হরণ করবার ক্ষমতা এসেছিল। যদি ক্ষমতাটা প্রয়োগ করবার সুযোগ পেতেন তাহলে সকালে উঠে পাইলটরা গিয়ে দেখত সব হেলিকপ্টারের প্রপেলারগুলো ঝুলে রয়েছে খেয়ে-ফেলে-দেয়া কলার খোসার মত, বিশাল রোটোর ব্লেডগুলো ল্যাগব্যাগ করছে খরগোছাগলের কানের মত—আকাশে ওঠার উপায় নেই। সেবার প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে নিয়ে ক্ষমতাটা প্রয়োগ করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, মাঝখান দিয়ে সব মাটি করল কিসিঞ্জারটা, খানিক ছুটোছুটি করবার পরই চট করে বসে গেল প্যারিসে, সই হয়ে গেল শান্তি চুক্তি। কাগজে খবরটা দেখবার সাথে সাথেই তিনি অনুভব করেছিলেন, চলে গেছে ক্ষমতাটা।

BanglaBook.org

এছাড়া চাকার ব্যাপারে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা এসেছিল ওঁর মধ্যে বছর কয়েক আগে। জানালা দিয়ে রাস্তায় সর্বহারা জনতার স্রোত দেখছিলেন, এমনি সময়ে চোখের সামনে যেই একটা ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট দেখলেন, অমনি ক্ষমতাটা বর্তেছিল ওঁর উপর। ইচ্ছে করলেই তখন তিনি পৃথিবীর সমস্ত গোল চাকাকে চারকোনা, এমন কি তিনকোনা করে দিতে পারতেন। সেটা হলে চলতে ফিরতে একটু ঝাঁকি লাগত ঠিকই, কিন্তু ব্রেক চাপার সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে পড়ত যে-কোন গাড়ি। সেবারও সাত-পাঁচ ভাবতে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া সময়ও দেয়া হয়েছিল খুব কম—চার দিনের দিন ক্ষমতাটা ছেড়ে চলে যায় ওঁকে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় বসেই কি করে পাক সেনাদের পরাজিত করা যায় সে আইডিয়াটা এসেছিল কিন্তু, প্রয়োগ করবার আগেই আত্মসমর্পণ করে বসল জেনারেল নিয়াজি। শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ।

কিন্তু এইবারের ক্ষমতাটা বেশ কিছুদিন ধরে রয়েছে। বরং দিন দিন আরও জোরালো হচ্ছে। তাছাড়া এবার তাড়াহুড়োও করেছেন তিনি। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ পেয়ে গেছেন তিনি সমাধানটা। কমরেড ফাজেল আহমেদ ভেবেছেন, দলাদলি করে নিজেদের শক্তির অপব্যয় না করে যদি সমস্ত ভাল আর সমস্ত খারাপ লোককে চিহ্নিত করার কোন উপায় বের করা যেত, তাহলে বিরাট এক ধাপ এগিয়ে যেত দেশ সত্যিকার সমাজতন্ত্রের দিকে। শোষকশ্রেণী, জোতদার, দালাল আর অসৎ লোক যদি চেনা যেত দেখা মাত্রই, তাহলে অতি সহজেই দেশ গড়ার জন্যে খাঁটি মানুষ বেছে বের করা যেত। ভাবতে না ভাবতেই নিজের ভিতর ক্ষমতাটা উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, তাঁরই উপর নির্ভর করছে এখন দেশের ভবিষ্যৎ। কে ভাল, কে মন্দ, সেটা বিচার করবার অধিকার তাঁর আছে কি নেই, সে সব নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে হয়নি তাঁকে। আছে। প্রচণ্ড এক মতবাদ আর আদর্শের জন্যে সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, তৈরি করেছেন ক্যাডার, কোন সমালোচনা না করে তোতাপাখির মত যারা শিখেছে তাঁর বুলি, এখন যদিও তাদের মনে একটা সন্দেহের ভাব, বিমর্ষ ভাঙনের ভাব এসে হাজির হয়েছে—কিন্তু একটি সিদ্ধান্তের ফলে আবার সবাই এসে জড়ো হবে তাঁর পিছনে। তিনিই পারেন, একটি নির্ভুল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। গোটা সমাজ জীবনেই ঢুকে গেছে দুর্নীতি, ভাল-মন্দ চিনবার উপায় নেই—এবার খাঁটি মানুষ বেছে নিয়ে পূর্ণোদ্যমে লাগবেন তিনি কাজে।

ব্যাপারটা কিভাবে ঘটাবেন, তাই নিয়ে অবশ্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়েছে তাঁকে। প্রথমে ভেবেছিলেন খারাপ লোকগুলোর কপালে কোন বিশেষ চিহ্ন এঁকে দেবেন, কিন্তু তাতে মনটা সায় দেয়নি। তারপর ভাবলেন সবার গায়ের রং পাল্টে দেবেন—লাল বা নীল, কিংবা সবুজ বানিয়ে দেবেন সব খারাপ লোককে। কিন্তু একটা ভয় রয়েছেঃ যদি দেখা যায় বেশির ভাগ মানুষই সবুজ হয়ে গেল, তাহলে ওরাই হয়ে যাবে মেজরিটি। বিপদ। এমন কিছু করতে হবে যাতে মেজরিটি হলেও যেন খারাপ লোকগুলো অক্ষম হয়ে পড়ে। কাজেই মাথায় এল আকার পরিবর্তন করবার কথাটা। এখানেও সমস্যা। বড় করবেন, না ছোট? প্রথমে ভাবলেন বড়ই করে দিই। প্রত্যেকটা খারাপ লোক যদি আকারে দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে মুহূর্তে অকেজো হয়ে পড়বে তারা। জামা-কাপড়গুলো বেকার হয়ে তো যাবেই, অত বিরাট দেহ নিয়ে সূক্ষ্ম কাজগুলো করবার উপায় থাকবে না আর তাদের। টেলিফোন ডায়াল করতে পারবে না, টাইপ রাইটারের একটা চাবি টিপলে তিন-চারটে চাবিতে টিপ পড়ে যাবে, দরজা দিয়ে ঢুকতে মাথায় ঠোকর খাবে, ঘুমাতে পারবে না—অর্ধেক শরীর বেরিয়ে থাকবে খাটের বাইরে,

BanglaBook.org

মোটকথা মহা অসুবিধেয় পড়ে যাবে—প্রাচীন যুগের ডাইনোসরদের মত লোপ পাবে পৃথিবী থেকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে খেপে গিয়ে মহা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিতে পারে ওরা, বিরাট আকার আর শক্তির জোরে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে সব। সর্বহারাদের যাও বা এক বেলা খাবার জোটে, সেটাও কেড়ে খেয়ে নিতে পারে ওরা।

কিন্তু ওরা যদি অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে আর এসব কিছু করতে পারবে না। অবশ্য এর ফলে কিছু সৎ বামন বিপদে পড়তে পারে, আগেই বেঁটে ছিলাম বললেও বিশ্বাস করতে চাইবে না মানুষ—কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে এইটুকু ত্যাগ তাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এগারটা পঞ্চান্ন। আর পাঁচ মিনিট পর কি ঘটবে ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল কমরেড ফাজেল আহমেদের। কোন মিল ম্যানেজার হয়ত ফ্যাক্টরিতে এসে নির্যাতিত শ্রমিকদের উপর হম্বিতম্বি করছে, হঠাৎ ঢোলা হয়ে যাওয়ায় প্যান্টটা খসে পড়ে যাবে তার, কিংবা কোন দালাল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বড় বড় বুলি ঝাড়ছে, গেল খাটো হয়ে; মাইকটা কি তখন নিচে নামিয়ে দেয়া হবে, না হেসে খুন হয়ে যাবে শ্রোতারা, কোন কথা শুনতে চাইবে না আর? সারাটা দেশ জুড়ে আর খানিক বাদেই মহা রগড় হবে আজ।

'খিদে! খোরাক দে!' বলল তোতাপাখি।

বাটি থেকে একটা দানা তুলে উঁচু করে ধরলেন কমরেড। ঘড়ির উপর চোখ রেখে বললেন, 'দারুণ মজার দৃশ্য হবে আজ কোর্টে। বিচার হচ্ছে, কেউ জানে না আসামী দোষী কি নির্দোষ। কিন্তু ঠিক বারোটা বাজার সাথে সাথেই যদি সে দোষী হয় ...'

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হল কমরেড ফাজেল আহমেদের। বড় কাঁটাটা এখন ছাপ্পান্নর ঘরে।

'কিংবা ধর, সেক্রেটারিয়েট, বেয়ারাকে ডাকল বেল টিপে, বেয়ারা এসে দেখবে পাঁচ বছরের বাচ্চার সমান অফিসার বসে আছে চেয়ারে—চশমাটা পড়ে গেছে চোখ থেকে খসে, জুতো জোড়া ছেড়ে পা দুটো মেঝে থেকে আট ইঞ্চি উপরে ঝুলছে। টাইয়ের গিঁঠ ঝুলছে বুকের কাছে। কিংবা, ইমামতি করছে এক বাটপার মৌলানা—পাজামাটা তো গেলই, নাক-চোখ ঢেকে গেল টুপিতে,' খিক খিক করে হাসলেন কমরেড।

'খিদে! খোরাক দে!' বলল পাখিটা, উনি দিলেন।

'সারাটা দেশ জুড়ে মজার মজার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আর তিন মিনিট পর। কত কি দেখার ছিল। কিন্তু ঘটনাটা ঘটবার মুহূর্তে তোমার সাথে একা এই ঘরে থাকতে চাই আমি, কমরেড তোতা। এই ঘরে। একা।'

উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে কমরেড ফাজেল আহমেদের শরীরটা। ঋজু ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে বসে আছেন তিনি, চোখজোড়া ঘড়ির উপর স্থির। শুধু উপলব্ধি নয়, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি, নড়ছে বড় কাঁটাটা। অতি সূক্ষ্ম ছোট ছোট ঝাঁকুনি খেয়ে এগারটা সাতান্নর কালো দাগটা ছেড়ে সরে যাচ্ছে কাঁটা, চুল পরিমাণ চিকন একটা সাদা দাগ তৈরি হল কাঁটা আর সাতান্নর দাগের মধ্যে, আর একটু বড় হল সাদা অংশটা, আটান্নর কালো দাগ আর কাঁটার দূরত্ব কমছে, ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল সাদা দাগ। প্রথমে কালো দাগ স্পর্শ করল, তারপর মাঝামাঝি এসে গেল কাঁটা, এবার এগোচ্ছে এগারটা উনষাটের দিকে।

'কাগজওয়ালারা প্রথমে বুঝে উঠতে পারবে না ব্যাপারটা। যদিও বেশকিছু দালাল সাংবাদিক মুহূর্তে খাটো হয়ে যাবে। চোখের সামনে দেখবে ওরা ঘটনাটা, তবু বিশ্বাস

BanglaBook.org

করতে চাইবে না কিছুতেই। কিন্তু যখন দেখবে, সবাই যাদের খারাপ জানে এরকম হাজার হাজার লোকের এই একই অবস্থা হয়েছে তখন, টের পাবে ওরা ব্যাপারটা।'

অ্যালার্ম ঘড়িতে এখন এগারটা উনষাট।

'দারুণ এক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, কি বল, কমরেড তোতা?' গলাটা চাপা, ফ্যাঁসফেঁসে। 'হৈ-চৈ পড়ে যাবে সারা দেশে। তুমুল হৈ-চৈ! কিন্তু কেউ জানবে না কে করল কাজটা। যতক্ষণ না প্রেস কনফারেন্স ডাকছি। ততক্ষণ জানব শুধু তুমি আর আমি।'

উনষাটের ঘর পেরিয়ে অর্ধেকটা সরে এসেছে বড় কাঁটা। আর আধ মিনিট! হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে কমরেড ফাজেল আহমেদের। চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে। ফিসফিস করে বললেন, 'কেউ জানবে না! কেউ না!'

বড় কাঁটার মাথাটা সবচেয়ে উপরের মোটা কালো দাগটা স্পর্শ করল। ছোট কাঁটাও বারটার দিকে চেয়ে রয়েছে, প্রায় ঢাকা পড়েছে বড় কাঁটার আড়ালে, রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রয়েছেন কমরেড ফাজেল আহমেদ। এমনি সময়ে ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল অ্যালার্ম বেল। বেজে গেল বারোটা। নিজের ভেতর প্রচণ্ড এক শক্তির জোয়ার অনুভব করলেন কমরেড, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত একটা সর্বগ্রাসী আবেগ, বজ্রপাতের মত একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। চোখ বুজলেন তিনি।

'এই মুহূর্তে!' বললেন কমরেড মৃদু কণ্ঠে। বলেই নুয়ে পড়লেন শ্রান্তিতে।

জানালার ধারে গিয়ে রাস্তার দিকে এক নজর চাইলেই বুঝতে পারতেন তিনি সত্যিই কাজ হল কি হল না। কিন্তু জানালার ধারে গেলেন না তিনি। যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। কারণ, বুঝতে পেরেছেন তিনি—কাজ হয়েছে।

অ্যালার্ম বেল থেমে গেল।

ঘাড় কাৎ করে নিচের দিকে চাইল তোতাপাখি। পালিশ করা পাথরের মত চোখ দিয়ে দেখল কমরেড ফাজেল আহমেদকে।

'খিদে! খোরাক দে!' বলল পাখিটা।

বাটি থেকে তাজা আইডিয়ার মত একটা কাঁচা ছোলা নিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মাথার উপর হাত তুললেন কমরেড, কিন্তু খাঁচা পর্যন্ত পৌঁছল না হাতটা, বাকি রয়ে গেল দেড় ফুট।

ঠিক সেই সময়ে পিচিক করে কিঞ্চিৎ মল ত্যাগ করল তোতাপাখিটা, টুপ করে পড়ল সেটা কমরেডের ছোট্ট, চকচকে টাকের উপর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এপ্রিল ফুল

আইডিয়াটা বদরুলের।

বাংলাদেশের সর্বাধুনিক মেডিকেল কলেজ। তিনজনেই ওরা ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। রাত দুটো।

ইচ্ছে করেই রাতের ডিউটি নিয়েছে জালাল, শরিফ আর বদরুল। কিন্তু এখন আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না সময়। পাঁচ পয়সা বোর্ডের ফ্ল্যাশ খেলে বিরক্তি ধরে গিয়েছে একেবারে। বিশাল ওয়ার্ডে টুঁ শব্দ নেই, সন্ধের পর বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ঠাণ্ডা পড়েছে, বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সব রোগী। হঠাৎ হাতের তাস ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসল বদরুল।

'দূর, ভাল্লাগছে না। আর কিছু করা যাক···' কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। 'চল্, এপ্রিল ফুল করা যাক ইমান আলী বুড়োকে!'

বুড়ো ইমান আলী মর্গের নাইট অ্যাটেণ্ডেন্ট। আটাত্তর বছরের থুত্থুড়ে বুড়ো। অতি ধীর চলাফেরা। শরীরটা যাও বা নড়ে, চিন্তা নড়তে চায় না। চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে স্থবির বৃদ্ধের, অনেক আগেই রিটায়ার করবার কথা, কিন্তু অসুস্থ, পঙ্গু স্ত্রী আর বিধবা মেয়েটাকে নিয়ে বেচারা একেবারে পথে বসবে বলে; আর তাছাড়া কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয় বলে দয়া পরবশ হয়ে রেখে দেয়া হয়েছে ওকে চাকরিতে। উপেক্ষা করেছে উপরওলায়ারা ওর বয়সের প্রশ্নটা।

'এপ্রিল ফুল?' চট করে ঘড়ি দেখল জালাল। 'ওহ-হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ পয়লা এপ্রিল।'

'দারুণ একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়!' বলল বদরুল, চকচকে চোখে চাইল বন্ধুদের মুখের দিকে।

'কি রকম প্ল্যান?' জিজ্ঞেস করল শরিফ। ভেঙে বলল বদরুল। মাথা নাড়ল শরিফ। 'না-না, এটা উচিত হবে না। আমার ভাল লাগছে না। বুড়ো মানুষ···ওর

BanglaBook.org

পেছনে লাগা ঠিক না।'

কিন্তু বদরুল সহজে দমবার পাত্র নয়। না বললেই হল? এমন একটা অরিজিনাল প্ল্যান মাথায় এসেছে, এটাকে কাজে না লাগালে মাঠে মারা যাবে। ওর কাছে তামাশাটাই আসল, কার ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা দেখবার দরকার নেই। মজা পাওয়া গেলেই হল। তর্ক শুরু করল সে।

শরিফ মানুষটা সত্যিই শরিফ। ঝগড়া-ফ্যাসাদ, তর্কাতর্কি এড়িয়ে চলে সব সময়। রাজি হয়ে গেল আর তর্কের ঠ্যালা সামলাতে না পেরে। আর জালাল তো রাজি হয়েই বসে আছে, সেকেণ্ড ইয়ার থেকেই অভ্যাস করেছে গোপনে স্পিরিট খাওয়া, ফুল ডোজ পেয়ে আজ মুডেই আছে সে। উঠে পড়ল তিনজন।

মর্গটা নিচের তলায়, মানে, বেযমেন্টে। করিডরে বেরিয়ে ওদের দু'জনকে দাঁড়াতে বলে চট করে ইমার্জেন্সির ডিউটিরুমে উঁকি দিয়ে দেখে এল বদরুল। যা ভেবেছিল, তাই। ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে বদরাগী ডিউটি অফিসার। বহুদিন আগেই ছাত্ররা ডায়াগনোজ করেছে, আলসার আছে ব্যাটার, সেইজন্যেই মেজাজটা এত তিরিক্ষি—কিন্তু সাহস পায়নি কথাটা ওকে বলতে। পা টিপে এগোল ওরা মর্গে নামবার সিঁড়ির দিকে।

নিচের সিঁড়িঘরটাই ইমান আলীর অফিস। ছোট্ট ডেস্কের ওপাশে একটা খটখটে কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ঘোলাটে চোখে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রয়েছে বুড়ো। চোখে খুবই কম দেখে বলে বইটই পড়ার প্রশ্নই ওঠে না, গান-বাজনা শুনে যে সময় কাটাবে তার উপায় নেই, সাড়ে এগারটার পর বাংলা-হিন্দী-উর্দু সব স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়—তাছাড়া রেডিওই নেই ওর আসলে। তাই শূন্য দেয়ালের দিকে চেয়ে ঠায় বসে থাকে ইমান আলী, পার করে দেয় দীর্ঘ সময় কখন ভোর ছ'টা বাজবে তার প্রতীক্ষায়। এইভাবে চুপচাপ বসে থেকে সে কিছু ভাবে কিনা জিজ্ঞেস করেনি কেউ ওকে কোনদিন, সবাই ধরে নিয়েছে—ভাবে না, চোখ খুলে ঘুমায় ও আসলে।

সিঁড়ির কাছে নড়াচড়া দেখে চোখ ফিরাল ইমান আলী এই দিকে। অনেকটা কাছে আসতে চিনতে পারল।

'বদরুল হাসান সায়েব না?'

ছোট একটা চিরকুট মত নাড়ল বদরুল বুড়োর নাকের কাছে। বলল, 'নানা, এগার নাম্বার লাশটা একটু দেখতে হবে। এই যে চেহারার বর্ণনা। মনে হচ্ছে এই অজ্ঞাতনামাই সেই ব্যাংকের ম্যানেজার। আজকের পেপারটা দেখনি?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ, এপ্রিল ফুল লেখা কাগজটা হাতে নিল, বলল, 'কিন্তুক···কিন্তুক আমি তো ঠিক···'

'ঠিক আছে, নানা,' বলল বদরুল, 'আমরাই দেখে দিচ্ছি তোমার হয়ে। স্ল্যাবটা বের কর তুমি।'

'এগার নম্বোর?' যাতে ভুলে না যায় সেজন্যে বার দুয়েক উচ্চারণ করে নিল বুড়ো। 'এগার। হুম, এগার নম্বোর।' কাগজটা একটা পাথর দিয়ে চেপে বহুকষ্টে উঠে দাঁড়াল সে, যেন কয়েক মন ওজন টেনে তুলছে। সুইংডোর ঠেলে মর্গে ঢুকল সে ধীর পায়ে, পিছু পিছু চলল তিনজন।

বড়সড় ঘরটা। অটোপ্সির জন্যে চারটে টেবিল সাজানো আছে কয়েক ফুট দূরে দূরে। শূন্য। ঘরের একটা দেয়ালে ব্যাংকের লকারের মত পাশাপাশি সাজানো গোটা বিশেক কম্পার্টমেন্ট। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ফাইল রাখবার ড্রয়ার। আঠার বাই চব্বিশ ইঞ্চি সাইজ, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্যে যথেষ্ট, যদি না তার পাশ ফেরার ইচ্ছে হয়। অবশ্য ঐ কম্পার্টমেন্টে যারা থাকে তারা কোনদিন পাশ ফিরতে চেয়েছে বলে

BanglaBook.org

শোনা যায় না। হিমশীতল কম্পার্টমেন্টের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অজ্ঞাতপরিচয়, বেওয়ারিশ লাশগুলো। কাটাছেঁড়া করবার পর গোরস্থানে পাঠিয়ে দেয়ার অপেক্ষায়। আধুনিক ব্যবস্থা—যাতে পচে না যায় সেজন্যে কম্পার্টমেন্টের ভিতর তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও কয়েক ডিগ্রি নিচে। রেফ্রিজারেটেড।

'এগার নম্বোর,' আবার উচ্চারণ করল ইমান আলী। '১১' লেখা কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল, ক্যাচ সরিয়ে স্লাইডিং স্ল্যাবটা টেনে বের করে আনল যতদূর আসে। আগাগোড়া সাদা কাপড় মোড়া লাশ শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে পরীক্ষা করে দেখার ভান করল বদরুল কিছুক্ষণ, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'সেই লোকই তো মনে হচ্ছে!' মাথা ঝাঁকাল বদরুল। 'তাই তো! মিলে যাচ্ছে অনেকটা!' ফিরল ইমান আলীর দিকে। 'পাওয়া গেছে। এর কাগজপত্রগুলো নিয়ে এস তো, নানা, দেখি কোথায় মরল, কিভাবে মরল। ভাল করে বুঝে দেখতে হবে ব্যাপারটা।'

'আনচি।'

আবার ধীর পায়ে শরীরটা বয়ে নিয়ে এগোল বৃদ্ধ তার ডেস্কের দিকে। শরিফকে চোখ টিপল বদরুল, ইমান আলীর সাথে রওনা হয়ে গেল সে-ও। সুইংডোরটা বন্ধ হয়ে যেতেই রগড়ের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বদরুল আর নেশাগ্রস্ত জালাল।

ডেস্কের উপর ঝুঁকে এগার নম্বরের কাগজপত্র পরীক্ষার ছলে ইমান আলীকে দেরি করাচ্ছে শরিফ, দুই মিনিটের মধ্যে সুইংডোর ঠেলে জালাল এসে ঢুকল।

'এসবের আর দরকার নেই, নানা,' বলল জালাল হাসি চেপে। 'ভুল হয়েছে আমাদের। সেই ম্যানেজারের আবার একটা ঠ্যাং খোঁড়া। এটার দুটো ঠ্যাংই আছে; মানে, ছিল; না, এখনও আছে। চল্, শরিফ, ওপরে গিয়ে কয়েকটা দান খেলা যাক আবার,' পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। 'তুমি ওটাকে আবার জায়গা মত ভরে দিও, নানা, খোলা পড়ে আছে লাশটা।'

কিছুদূর গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জন। ধৈর্যের সাথে কাগজপত্র যথাস্থানে রেখে দিচ্ছে ইমান আলী। কোন ব্যস্ততা নেই ওর কোন কাজে। বোঝা যায়, ওপারের ডাকের জন্যে দিন গুনছে লোকটা, না করলেই নয়, তাই করছে কাজ পরম সহিষ্ণুতার সাথে। কাগজগুলো গুছিয়ে রেখে সুইংডোর ঠেলে আবার ঢুকল সে মর্গে, দেহটা টেনে নিয়ে চলল এগার নম্বর কম্পার্টমেন্টের দিকে, লম্বা হয়ে বেরিয়ে রয়েছে স্ল্যাবটা ওখানে, তার উপর সাদা চাদর ঢাকা লাশ।

দশ বারো ফুটের মধ্যে পৌঁছতেই নড়ে উঠল সাদা কাপড়টা। গোঙানির মত শোনা গেল একটা, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল লাশটা। মুখের উপর থেকে সরে গেল সাদা কাপড়। ম্লান আলোয় দশ ফুট দূর থেকে বদরুলকে চিনতে পারল না ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ।

'আমি কোথায়!' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল বদরুল। 'কোথায় নিয়ে এসেছ তুমি আমাকে!' অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল ইমান আলী, দুই চোখ বিস্ফারিত। চাদরের মধ্যে থেকে একটা কাঁপা হাত বের করে নাটুকে ভঙ্গিতে বদরুল বলল, 'বাঁচাও! নইলে মেরে ফেলবে ওরা আমাকে!'

অভিনয়টা অত্যন্ত কাঁচা, অমার্জিত—বদরুলের প্রায় সব রসিকতার মতই স্থূল। কিন্তু বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ, যার মস্তিষ্ক পর্যন্ত ঘোলা হয়ে গেছে কালের অবক্ষয়ে, তার কাছে কোন খুঁত ধরা পড়ল না। রুদ্ধশ্বাসে লাশটার দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেণ্ড, তারপর পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করল। গত বিশ বছরে এত জোরে দৌড়ায়নি

BanglaBook.org

সে। সিঁড়ির দিকে ছুটছে, আর শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করছে, 'ডাকটার সায়েব! আল্লার রহমত! বেঁচে আচে, বেঁচে আচে লোকটা। জ্যান্ত হয়ে উঠে বসেচে লাশ! ডাকটার সায়েব!'

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় দৌড়ে উপরে উঠে গেল ইমান আলী, একহাতে রেলিং অন্য হাতে ওপাশের দেয়াল ধরে ধরে। থামের আড়ালে দাঁড়ানো জালাল আর শরিফকে দেখতেই পেল না। মর্গের ভিতর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বদরুল, হাসির দমকে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে শরীরটা, একলাফে নেমে পড়ল সে বারো নম্বর কম্পার্টমেন্টের স্ল্যাব থেকে, চাদরটা ভিতরে ছুঁড়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিল স্ল্যাবটা যথাস্থানে, ক্যাচটা লাগিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে এগোল সুইংডোরের দিকে। আসলে এগার নম্বর স্ল্যাবটা লাশসহ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল আগেই, বারো নম্বরটা খালি ছিল, সেটা খুলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল বদরুল বুড়োকে ভয় দেখাবার জন্যে। বোকা বুড়ো ভয় তো পায়ইনি, ছুটেছে ডিউটি অফিসারকে খবর দিতে। এতেও অবশ্য রগড় কম হল না। বদমেজাজী লোকটা যখন এসে দেখবে···ভাবতেই পেটে খিল ধরে এল বদরুলের।

হাসির দমকে দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল বদরুলের। সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে এসেই বলল, 'কাম অন, জলদি! ডক্টর আলসার আসছে! হিঃ হিঃ হি! ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই আমরা।'

ওয়ার্ডে ফিরে এসে তাস হাতে বসে পড়ল তিনজন। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল করিডর ধরে দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে ইমার্জেন্সির ডিউটি অফিসার মর্গের সিঁড়ির দিকে, পিছন পিছন প্রলাপের মত বকতে বকতে চলেছে বুড়ো ইমান আলী।

'নিজ চোকে দ্যাকা, ডাকটার সায়েব, এ···ই রকম করে উটে বসলে! উটে বসে আমার দিকে চাইলে! চেয়ে বললে···

কথাবার্তার আওয়াজ মিলিয়ে গেল দু'জন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতেই। প্রাণ খুলে হাসল বদরুল, পেট চেপে ধরে বাঁকা হয়ে গেল। হাসিতে যোগ দেয়ার চেষ্টা করল জালাল, দু একবার খুক খুক করে দেখল হাসি আসছে না, চুপ হয়ে গেল সে। এই ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজি হওয়ায় নিজের উপরই চটে গেছে শরিফ, অস্বস্তি চাপা দেয়ার জন্যে সিগারেট ধরাল একটা। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে ওর।

তিন মিনিট পর করিডরে দেখা গেল, পরমুহূর্তে দরজায় এসে দাঁড়াল ডক্টর আলসার, হাতে এপ্রিল ফুল লেখা স্লিপটা। কঠোর দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ডিউটি অফিসার তিনজনকে।

'তামাশা বের করছি তোমাদের!' হাতের চিরকুটটা নাড়ল। 'গোপালভাঁড় একেকজন! রসের রাজা! কাল প্রিন্সিপালের হাতে পৌঁছবে এটা,' আর কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করল না সে। গটমট করে হেঁটে চলে গেল ডিউটিরুমে।

নেশা ছুটে গেল জালালের। ওকে দিয়েই লিখিয়েছিল বদরুল এপ্রিল ফুল।

'আলসারের চেহারাটা খেয়াল করলি?' দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে হেসে খুন হয়ে গেল বদরুল। নিজের রসিকতায় সব সময়ই এক রকম করে গা কাঁপিয়ে হাসে সে। 'মনে হচ্ছিল রাগের ঠেলায় পেচ্ছাপ করে ফেলবে এখুনি। মনে হচ্ছিল···আরে, কি হল তোদের?' জালাল আর শরিফ হাসছে না দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল? গোমড়ামুখো ভূত নাকি? ঠাট্টা-তামাশা বুঝিস না? কেমন বেরসিক তোরা, হাসির কথায় হাসি আসে না?'

'আমি বাথরুম থেকে আসছি,' বলে বেরিয়ে গেল শরিফ।

'রসিকতায় যাদের হাসি আসে না তাদের ইংরেজিতে কি বলে জানিস?' শরিফের

BanglaBook.org

গমন পথের দিকে ইঙ্গিত করে জালালকে জিজ্ঞেস করল বদরুল।

মাথা নাড়ল জালাল। 'জানি না। তবে আজকেরটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে মনে হচ্ছে এখন। কাজটা করা ঠিক হয়নি। তুই বোস, আমি দেখি আলসার ভাইকে ভজিয়ে ভাজিয়ে মাফটাফ চেয়ে চিরকুটটা আদায় করা যায় কিনা,' কথাটা বলেই বেরিয়ে গেল জালাল।

মুখ বিকৃত করল বদরুল। রাগ হল সবার উপর। হাসি-তামাশাকে কেউ হাল্কাভাবে নিতে না পারলে বড় রাগ লাগে ওর। আরে ব্যাটা, হাসির কথায় হাসবি না তো কি পরীক্ষায় ফেলের খবর পেলে হাসবি? সেন্স অফ হিউমারই যদি না থাকল তাহলে জানোয়ারের সাথে তফাৎ কি রইল মানুষের? মনে মনে শরিফ আর জালালকে পরামর্শ দিল সেঃ আরে বাবা, হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়!

মাগো বলে একটা রোগী পাশ ফিরে শুলো। চট করে একটা মজার বুদ্ধি এসে গেল ওর মাথায়। দারুণ এক প্ল্যান এসেছে ঐ রোগীটাকে নিয়ে। এবার আর হেসে গড়াগড়ি না খেয়ে উপায় নেই বাছাধনদের। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে প্ল্যানটাকে আর একটু ঘষেমেজে আর একটু চোখা করবার চেষ্টা করছিল, এমনি সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বুড়ো ইমান আলী।

'কাজটা আপনার ঠিক উচিত হোইনিকো, বদরুল হাসান সায়েব,' সাদামাঠা কণ্ঠে বলল ইমান আলী, কোন রকম অনুযোগ বা অভিযোগের আভাস নেই গলায়। 'দৌড়ঝাঁপ করে বুকে হাঁপ ধরে গেচে, কিন্তুক ওজন্যে কিচু না, ওতে আমি কিচু মনে করিনি। কিন্তুক লাম্বা ডাকটার সায়েব ভায়ানক চটে গেচেন। এমনিতেই আমাকে মোটে পচোন্দ করেন না, এই সিদিনও নালিশ করেচেন, বুড়ো-হাবড়া দিয়ে কাজ চলবে না—আজ মাহা খাপ্পা হয়েচেন,' কথাগুলো বলে একটু দম নিল। 'সব মড়া যার যার জায়গায় নিচ্চিন্তে শুয়ে আচে দেকে ধমক মারতে লাগলেন, ভীমরতি ধরেচে, চোকে সষ্যেফুল দেকচি, আরও কত কি! আপনার কতা বলতে তবে গে রেহাই। বুজে গেলেন ওটা আপনার তামাশা,' আবার একটু থেমে দম নিয়ে নিল বৃদ্ধ। 'শেষে বললেন, আর যদি বোকার মতন কোন তামাশা নিয়ে ওনার কাচে যাই, কালই আমার চাকরি শেষ। তোমার দুটো হাতে ধরি, দাদাভাই, আমি মুখ্যু-সুখ্যু বোকা মানুষ, আর আমাকে নিয়ে কোন তামাশা কোরো না, লক্ষ্মী। চাকরিটা গেলে না খেয়ে মরতে হবে আমাদের সব ক'জনাকে। তামাশা করে চাকরিটা খেয়ো না আমার, ভাই।'

কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে বদরুলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইমান আলী, আরও কিছু বলা দরকার কিনা ভাবল হয়ত, আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে শরীরের বোঝা টেনে টেনে এগোল মর্গের সিঁড়ির দিকে। সাবধানে এক পা এক পা করে নেমে গেল নিচে। ডেস্কের ওপাশে বসে ঘোলাটে চোখে চেয়ে থাকবে ফাঁকা দেয়ালের দিকে, কখন সকাল হবে সেই অপেক্ষায়।

কাঁধ ঝাঁকাল বদরুল। সব শালা বেরসিক। শরিফ এসে ঢুকতেই নতুন প্ল্যানটার কথা ভেঙে বলল সে ওকে। কটমট করে বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল শরিফ, তারপর স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিল এসবের মধ্যে সে নেই; শুধু তাই নয়, রোগী নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করতে গেলে সোজা গিয়ে ডিউটি অফিসে রিপোর্ট করবে।

মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল বদরুলের। উঠে দাঁড়াল। 'জালাল শালা গেছে আলসারের পায়ে তেল দিতে। এলে বালিস, আমি চা খেতে গেলাম, ইচ্ছে হলে আসতে পারে,' গোল একটা ধোঁয়ার রিং ছাদের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। দ্রুতপায়ে হাঁটছে হাসপাতালের পিছন দরজার দিকে।

BanglaBook.org

রাস্তায় বেরিয়ে মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল বদরুলের। কাজটা বোধহয় সত্যিই ঠিক হয়নি, নইলে কেউই মজা পেল না কেন? প্রায়ই হয় এরকম। কিছু কিছু রসিকতায় সবাই হাসে—সেই যে-বার ক্লাসরুমে ফ্যানের তিন ব্লেডের উপর তিন তোলা নস্যি রেখে দিয়েছিল, ফ্যান ছাড়তেই সারা ঘরময় নস্যি ছড়িয়ে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী-প্রফেসর সবার সে কি হাঁচি! অন্যান্য ক্লাস ছেড়ে ছুটে এসেছিল সবাই, মায় প্রিন্সিপাল পর্যন্ত!—কিংবা সেই যে স্যারের চেয়ারে দেড়শো ছারপোকা ছেড়ে দেয়া, কিংবা, মৌলবী স্যারের চেয়ারের পিঠে আঠা লাগানো কাগজ আটকে রাখা, ঘন্টা পড়তে স্যার যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখা গেল পিঠে সেঁটে আছে কাগজটা, তাতে বড় করে লেখা রয়েছে 'গাধা'। সবাই হেসেছিল। কিন্তু কোন-কোনটায় ও নিজেই শুধু হেসে খুন হয়ে গেছে, আর কেউ হাসেনি, অনেকে রেগে গিয়েছে। কেন যে হয় এটা বুঝতে পারে না সে। হাসিকে স্রেফ হাসি হিসেবে কেন যে সবাই নিতে পারে না। ছোটবেলায় প্রজাপতি ধরে তার একটা ডানা কেটে দিয়েছিল, কেমন বিটকেল ভঙ্গিতে ওড়ার চেষ্টা করছিল ওটা ভাবতে এখনও হাসি পায় ওর—কিন্তু সেদিন কেউ হাসেনি। কেন হাসছে না জিজ্ঞেস করায় ওর ছোট বোন বলেছিল প্রজাপতিটার কষ্ট হচ্ছে বলে ওর হাসি আসছে না। ও বলেছিল, ওটার কষ্ট হয় হোক, আমার তো হাসি আসছে, তুই হাসবি না কেন? চড় মেরেও হাসাতে পারেনি ও সেদিন ছোট বোনকে।

আরও অনেক ঘটনা আছে, স্যারের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়ত উঠে দাঁড়িয়েছে পাশের ছেলেটা, চোখা করে কাটা ছোট্ট পেন্সিলটা ওর সিটের উপর রেখে দিল সে খাড়া করে, কিংবা বিছুটি পাতা ঘসে দিল কারও গায়ে। হাসে না কেউ—রেগে যায়। এই মেডিকেল কলেজেই সেকেণ্ড ইয়ারে পড়বার সময় আবিষ্কার করেছিল, মেয়েদের হোস্টেল থেকে কলেজে আসবার রাস্তার পাশেই একটা ঝোপের ধারে বিরাট এক বাসা আছে ভীমরুলের। মামার গাড়িটা নিয়ে জানালাগুলো ভাল মত বন্ধ করে দিয়ে ঢিল হাতে অপেক্ষা করেছিল সে কাছাকাছিই, চোখের নিচে রুমাল বেঁধে নিয়েছিল যাতে চেনা না যায়। ছাত্রীদের একটা বড়সড় দল যখন ঠিক চাকের কাছাকাছি এসেছিল অমনি ধাঁই করে ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরে দিয়ে এক লাফে উঠে বসেছে সে গাড়িতে। তারপর সে কী মজার কাণ্ড! কয়েকশো জেট ফাইটার প্রথমে সোজা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির উপর, কিন্তু কাচ সব তোলা, ঢুকতে না পেরে আরও রেগে গিয়ে গাড়ি ছেড়ে সবক'টা আক্রমণ করল মেয়েদের সেই দলটাকে। উহ্! সে কী নাচ! সে কী আনন্দ! চিৎকার করছে, পাগলের মত গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদামাটিতে, সে কী দৃশ্য! গাড়ির ভিতর নিরাপদে বসে হাসতে হাসতে খিল ধরে গিয়েছে ওর পেটে, সবটুকু মজা লুটে নিয়ে ভোঁ করে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে ও। কিন্তু আর কেউ হাসেনি। যদিও সবাই টের পেয়েছে কাজটা কার, সিভিয়ার অ্যাকশন নেয়ার চেষ্টায় বেশ কিছুদিন তৎপর থেকেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ধরতে পারেনি ওকে।

প্র্যাকটিক্যাল জোক কেন যে মানুষ সহজভাবে নিতে পারে না! মেঝেতে কলার খোসা ফেলে কাউকে আছাড় খাওয়ানো যে কতবড় আর্ট, বুঝতে পারে না। বোঝে না, জোক ইজ জোক। প্রাণ খুলে হাসতে না পারলে কী অর্থ এই জীবনের? যাই হোক, এটা সেই রকম আরেকটা বলে মনে হচ্ছে, কেউ হাসল না, বরং রেগে গেল ওর উপর। তা যাক, পরোয়া করে না সে। ও জানে, কেউ দেখতে পারে না ওকে। অ্যানাটমির লেকচারার ক্লাসে যেদিন ঘোষণা করলঃ তোমার নামের শুরুই রয়েছে 'বদ' দিয়ে, তাই তোমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে বদ চিন্তা, বদ-বুদ্ধি আর বদ কাজ। বদ কাজ করে মানুষকে হাসাবার চেষ্টা কর বলে তোমার নাম বদরুল হাসান। —সেদিন এই ভোঁতা

BanglaBook.org

রসিকতায় ক্লাসসুদ্ধ সবার সে কি হাসি। কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না ওকে, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না ওর। ওর ভিতর থেকে ভুড়ভুড়ির মত মজার মজার সব বুদ্ধি বেরিয়ে আসে একের পর এক—আছে কারও এই ক্ষমতা? নেই। তাই হিংসা করে আসলে সবাই ওকে।

হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে চলে এল বদরুল। খোলাই আছে রেস্তোরাঁটা। আলো জ্বলছে। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটা খুশি খুশি ভাব এসে গেল ওর মধ্যে। 'কো কো কোরিনা' শিস দিতে দিতে এগোল সে নদীর তীর ধরে রেস্তোরাঁটার উদ্দেশে।

রাত পৌনে তিনটে। রেস্তোরাঁয় এক কাপ চা সামনে নিয়ে বসে আছে শুধু একজন খরিদ্দার। এক নজরেই বুঝে ফেলল বদরুল—ব্যর্থ প্রেমিক। চা সামনে নিয়ে উদাস চোখে চেয়ে রয়েছে নদীর দিকে। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই। কিংবা হয়ত চা ঠাণ্ডা করে খাওয়াই অভ্যাস লোকটার। পাশের টেবিলে বসে চায়ের অর্ডার দিল বদরুল। হাসিখুশি দিলু মিয়া কেটলি চড়িয়ে দিল গনগনে আগুনে।

চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে তশতরির উপর নামিয়ে রাখল উদাস লোকটা, আবার চেয়ে রইল বাইরের দিকে। চট করে একটা দারুণ বুদ্ধি খেলে গেল বদরুলের মাথায়। অনেক কষ্টে হাসিটা চেপে রাখল সে নিজের মধ্যে। প্রায় ফুটন্ত চায়ের কাপ ওর টেবিলে রেখে দিলু মিয়া যেই পিছন ফিরল, অমনি চোখের পলকে উদাস লোকটার কাপের সাথে বদলি করে ফেলল বদরুল নিজের কাপটা। দিলু মিয়া চলে যাচ্ছে, পিছন থেকে ডাকল সে। একা একা মজা দেখে পুরো সুখ নেই, উপভোগ করার জন্যে আরও দর্শক দরকার। সঙ্গী ছাড়া জমে না কোন তামাশা।

পিছন ফিরল দিলু মিয়া, এগিয়ে এল। ব্যবসা সংক্রান্ত সাধারণ একটা প্রশ্ন করল বদরুল, সেই সাথে চোখের ইশারা করল ব্যর্থ প্রেমিকের দিকে। কিছুই বুঝল না দিলু মিয়া, হাঁ করে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আবার মাথা ঝাঁকিয়ে ঐ দিকে চোখ টিপে ইশারা করল বদরুল, ফিসফিস করে বলল, 'দ্যাখ মজা!' চোখে-মুখে ওর হাসির ঝিলিক, বহু কষ্টে চেপে রেখেছে অট্টহাসি।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ল উদাস প্রেমিকের, হয়ত মনে পড়ল কোথাও যেতে হবে, নদীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে তুলে নিল কাপটা। এক ঢোকে ঠাণ্ডা চা শেষ করে উঠে পড়বে বলে গলায় ঢালল। পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল লোকটা, পড়ে গেল চেয়ার উল্টে। শুধু যে জিভ পুড়ে গেছে তাই নয়, বিষম লেগে গিয়ে কাশতে শুরু করল ভয়ানকভাবে।

টিনের চাল কাঁপিয়ে হাসতে আরম্ভ করল বদরুল। চেঁচিয়ে উঠল 'এপ্রিল ফুল!' হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল ওর। চোখ মুছে চাইল দিলু মিয়ার দিকে প্রশংসা পাওয়ার আশায়।

এদিকে কাশি সামলে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা, ব্যাপার বুঝে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। খপ্ করে কলার ধরে একটানে দাঁড় করিয়ে ফেলল বদরুলকে।

'বিটলামীর জাগা পাও নাই, হালায় নাটকার জানা! আমার লগে ফাৎরামী। পালিস কইরা ফালামু না!'

দড়াম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি পড়ল ওর নাকের উপর, পরমুহূর্তে আরেকটা পড়ল ঠোঁটের উপর। মুখটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল বদরুল, কানের উপর পড়ল নক-আউট পাঞ্চ। চেয়ার-টেবিল উল্টে কয়েক পা পিছিয়ে গেল বদরুল টলতে টলতে, কিছু একটা ধরে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুই বাধল না হাতে। পড়ে যাচ্ছে চিৎ হয়ে। ঠাস করে মাথাটা পড়ল একটা কাঠের চেয়ারের উপর। সেখান থেকে মাটিতে। পরিষ্কার টের

BanglaBook.org

পেল বদরুল, কড়াৎ করে শব্দ হল ঘাড়ের কাছে-- পরমুহূর্তে দপ করে নিভে গেল সব আলো।

ফোঁস ফোঁস হাঁপাচ্ছে লোকটা, রাগের ঠেলায় মত্ত এক লাথি তুলল, মারলও, কিন্তু পিছন থেকে দিলু মিঞা ওকে জাপটে ধরে ফেলায় তত জোরে লাগল না, সুপারির মত একটা জায়গা শুধু ফুলে উঠল কপালের।

'মারি লাইবেন দ, রোস্তম মিয়া! মরি যাইব ঠাইট!'

'মাইরাই ফালামু!' বলল রুস্তম। 'মানু চিনে নাই। হালায় আমার লগে আইছে দিল্লাগী করবার!'

চেয়ার টেবিল সোজা করতে করতে হঠাৎ থমকে গেল দিলু মিয়া। 'মাইচ্চেন বড় জবর! কিন্তুক লড়ে না দি।'

'মাগার গোস্যা যাইতাছে না অহন তরি। হালার দাত কয়টা ফালায়া দিবার পারলে···আরি! কাল্লাটা ইমুন ট্যারা হইয়া রইছে কেলেগা! দ্যাহো তো দিলু মিয়া, হালায় ফতে হইয়া গেল নিকি আবোর!'

নিচু হয়ে বসে বদরুলের হাতের পালস দেখল দিলু মিয়া, তারপর চট করে হাতটা জামার ভিতর ঢুকিয়ে বুকের উপর রাখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর হাসিখুশি মুখটা। ফিসফিস করে বলল, 'দম নাই। ইন্তেকাল কইচ্চে।'

'অ্যাঁ! কি কইলা? মইরা গেছে? বেশি জোরতে তো মারি নাইক্কা, বেমক্কা পইরা গেল নিকি ঘুসাটা।'

'সাইচ্চে! আঁরে এইবার মাইচ্চে!' তিন লাফে দরজার কাছে চলে গেল দিলু মিয়া, বাইরেটা চট করে একবার দেখে নিয়েই বন্ধ করে দিল দরজা। 'কতোল কইচ্চে!'

'অ্যাকসিডিন্,' বলল রুস্তম। 'অ্যাকসিডিন্ হইয়া গেছে গা। অহন কেমতে কি করবা কও।'

'ছাত্র,' বলল দিলু মিয়া। 'বড় ফাজি মাইনুষ। মরণ আছিল্, মইচ্চে। কিন্তুক ইয়াঁনো কা? আঁর উফর ফুলিশের নজর বড় কড়া। আমনেও মাইরপিটের লাই হাজত খাটছেন। অহন কি কইত্তাম, কিছু দ বুজে আইয়ে না!'

'এক কাম কর,' বদরুলের পকেট সার্চ শুরু করল রুস্তম। 'গাপ কইরা ফালাই হালারে। আরিব্বাপ! এই হালায় তো আবোর মেডিকেলের ইস্টুডেন। এক কাম কর, আমার বেবিটা এই পিছনের কেওরের কাছে লইয়া আহো। কাপড়চুপুড় খুইলা দুই মাইল দূরে ফালায়া দিমু গাঙ্গের পারে। ক্যাঠা কারে মাইরা ফালায়া থুইয়া গেছে কে জানে?'

এক কথায় রাজি হয়ে গেল দিলু মিয়া। দশ মিনিটের মধ্যেই রওনা হয়ে গেল ওরা। বেবিট্যাক্সি চালাচ্ছে রুস্তম, দিলু মিয়া বসে আছে পিছনের সিটে, তার পাশে কাৎ হয়ে হুড়ে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে বদরুল।

হঠাৎ করেই জ্ঞান ফিরল বদরুলের। পুরোপুরি অবশ্য না, সিকিভাগ জ্ঞান ফিরল ওর। বুঝতে পারল যে বেঁচে আছে সে। নড়াচড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গও কথা শুনল না ওর। সারা শরীর অসাড়। অনড়। কোন ব্যথা নেই কোথাও, কোন বোধ নেই। কেমনভাবে কোথায় শুয়ে আছে পরিষ্কার বোঝা গেল না, তবে মনে হল কোন সমতল জায়গায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে।

ঘাড়ের সেই শব্দটার কথা মনে পড়ল ওর আবছা ভাবে। স্কুলে থাকতে এই

BanglaBook.org

ভার্টেব্রাটা বাঁকা হয়ে গিয়েছিল একবার। সেবার ফুটবল খেলতে গিয়ে হয়েছিল। আবার মোচড় খেয়েছে ওটাই। একমাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল সেবার। নড়াচড়ার শক্তি ছিল না। এবার বোধহয় আরও বেশি দিন থাকতে হবে। হাড়টা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল কিনা কে জানে! কড়াৎ শব্দ শুনতে পেয়েছে সে পরিষ্কার।

এমনি সময় কথা বলে উঠল কে যেন। মনে হল বহুদূর থেকে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছে কথাগুলো।

'এই রইল কাগজপত্র,' বলল লোকটা। গলাটা চেনা চেনা লাগল, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না বদরুল। বলছে, 'এটাকে পাওয়া গেছে নদীর ধারে। কোন আইডেন্টিফিকেশন পেপার পাওয়া যায়নি, বেওয়ারিশ, পড়েছিল জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায়। চেহারার যা অবস্থা, মনে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা যাবেও না। যাই হোক, বারো নম্বরে ঢুকিয়ে দাও এটাকে, পোস্টমর্টেম কাল হবে।'

ডক্টর আলসার! কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরেছে বদরুল এতক্ষণে। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। বদরুল অনুভব করল, নাড়াচাড়া করা হচ্ছে ওর শরীরটা। মাথাটা উঁচু করে ফিরিয়ে দেয়া হল একপাশে। ঘাড়ের ভিতর খুট করে শব্দ হল একটা, হঠাৎ চোখ মেলতে পারল সে। মনে হল গুরুত্বপূর্ণ কোন নার্ভের ওপর থেকে সরে গেল চাপ।

প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেও চোখ মেলেই বুঝতে পারল সে কোথায় আছে। পরিষ্কার চিনতে পারল পায়ের কাছে দাঁড়ানো লোকটাকে। 'নানা!' অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল বদরুল। 'ইমান আলী!'

খেয়াল করল না বৃদ্ধ, আপন মনে হাত পা টেনে টেনে সোজা করছে সে বদরুলের। আবার ডাকল বদরুল।

'নানা!' এবার আর একটু জোরে ডাকল সে। 'নানা, আমি বেঁচে আছি!'

পিছন ফিরে ছিল ইমান আলী, ধীরে ধীরে ঘুরল। কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া। মনে হল কিছু আওয়াজ কানে গেছে তার। মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল বদরুল।

'ইমান আলী!' ব্যাঙের ডাকের মত আওয়াজ বেরুল ওর গলা দিয়ে। 'আমি, বদরুল হাসান! বেঁচে আছি আমি। জলদি ডাক্তার ডেকে আন!'

ভড়কে গেল ইমান আলী। ঝুঁকে এল বদরুলের মুখের কাছে, ভাল মত ঠাহর করে দেখবার চেষ্টা করছে। বিড় বিড় করে বলল, 'তাই তো! বদরুল হাসান সায়েবের মতনই তো লাগছে কিচুটা। এমন ফোলা ফুলেচে যে বোজার সাদ্যি নেই।'

'জলদি, নানা!' আকুতি ফুটে উঠল বদরুলের কণ্ঠে। বুঝতে পারছে, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে ও এখন। বোকা বুড়ো স্ল্যাবটা ঠেলে ঢুকিয়ে দেবে তাহলে। 'বিশ্বাস কর, বেঁচে আছি আমি। ডাক্তারকে খবর দাও!'

স্তিমিত-বুদ্ধি ইমান আলীর কাছে স্পষ্ট হল না কিছুই। আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'মড়া আবার কতা বলে নাকি, বদরুল হাসান সায়েব?' সাদা একটা চাদরের ভাঁজ খুলল সে ধীরে সুস্থে। বলল, 'আর ঠকাতে পারবেন না আমাকে,' চাদরটা ঝেড়ে নিয়ে ঢেকে দিল বৃদ্ধ বদরুলের শরীরটা আপাদমস্তক।

'নানা!' চাদরের নিচে ককিয়ে উঠল বদরুলের ভীত কণ্ঠস্বর।

'না, দাদাভাই,' মাথা নাড়ল ইমান আলী। 'তোমার দুটো হাত ধরে বলেচি, তামাশা করে আমার চাকরিটা খেয়ো না। আবার আরাক মশকরা নিয়ে ডাকটারের কাচে গেলে মাহা খাপ্পা হয়ে যাবেন উনি। আমি বুড়োহাবড়া মানুষ, আমাকে বোকা বানিয়ে কি লাভ তোমার? একবার জব্দ করেচ, যতেষ্ট হয়েচে। উঁহু, আবার কিসের তামাশা?'

ধীরে ধীরে ঠেলে স্লাইডিং স্ল্যাবটা ঢুকিয়ে দিল সে বারো নম্বর কম্পার্টমেন্টের মধ্যে,

BanglaBook.org

ক্যাচ লাগিয়ে দিল।

তারপর শরীরটা বয়ে নিয়ে এগোল সুইংডোরের দিকে। ছোট্ট ডেস্কের ওপাশে বসে ঘোলাটে চোখে চেয়ে থাকবে ফাঁকা দেয়ালটার দিকে। ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করবে সকালের।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org